সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন = জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

জীবনানন্দের নদী

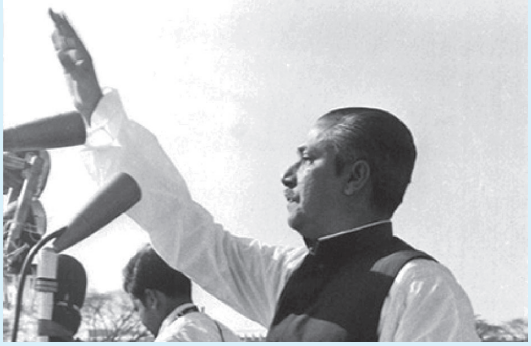

৭ই মার্চ, শুধু আমাদের

অসীম সরকার

আজ আমাদের, বাঙালির জেগে ওঠার দিন
নবপ্রভাতে শ্যামল বাংলায় সূর্য ওঠা
শতাব্দীর বঞ্চনার শেকলভাঙা রবি-নজরুলের
গান গাইবার দিন
আজ বুকে বোধের বারুদমশাল জ্বালার দিন
নতুন বসন্তের দ্বারোদ্ঘাটন
বিদ্রোহের কবিতা লেখা কবিতা পড়া এবং
কবিতা শোনার অনন্য দিন
আজ সাহসী যৌবনে রাজটিকা পরার দিন
প্রেমিকার মাথায় ফুলপরা ফসল বোনা
তর্জনী উঁচিয়ে সমবেত জনতার সামনে মুক্তির
আহ্বান ঘোষণার দিন
বিশ্বের তাবৎ উত্তাল দিন এবং স্থাপত্যের সেরা
৭ই মার্চ, শুধু আমাদের–
বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের চিরভাস্বর স্বপ্নমোড়া
উচ্ছ্বাসের এক দিন
৭ই মার্চ মানে– মাথার 'পরে একটি মুক্ত-আকাশ
বুভুক্ষু 'পরানের গহীনে' ধান খাল নদী মাঝি আর
'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন'
৭ই মার্চ মানে– জয়বাংলা
মুজিবের বজ্রনিনাদ জনতার মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাত
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অমর মহাকাব্য পাঠের দিন।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৪ ● ১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচি

জীবনানন্দের 'নদী' - আমীন আল রশীদ	২
একুশ আমার অহংকার - মো. মাহবুব হোসেন	৫
একুশে পদকপ্রাপ্ত আলহাজ্ব রফিক আহামদকে সংবর্ধনা	৭
সিদীপে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত	৭
'গীতাঞ্জলি' পাঠাগারের কথা - হাছিনা নার্গিস	৮
হাওরের মাছ, মাছধরা ও সংস্কৃতি - রঞ্জন মল্লিক	১০
কবিতা	১৮
শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার থালাবাটি নয়, বই - অলোক আচার্য	২০
৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন	২৪
লেবু চাষে সফল এক কৃষাণীর গল্প - মো. আব্দুল মান্নান সরদার	২৬
অদম্য কৃষাণী হাবাধন বিবির সফলতার কথা - সঞ্জীব মন্ডল	২৭
নদীর কথা নিয়ে 'নোঙর' - মো. জাহিদুল ইসলাম	২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এ দেশের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতি নদীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথা। বাংলার কবিতায়, গানে, গল্পে ও ছবিতে তাই নদীর অনন্য অবস্থান। আধুনিকদের মাঝে অগ্রগণ্য রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দের কবিতায় এই নদী এসেছে আরও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে। নদী যেন তাঁর কবিতায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, ভালবাসে, কথা বলে, আরও কত কী–ঠিক মানুষের মত। বহুল সমাদৃত 'জীবনানন্দের মানচিত্র' বইয়ের লেখক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আমীন আল রশীদের বর্তমান লেখাটিতে নদীঅন্তপ্রাণ কবির সেই দিকটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে ফুটে উঠেছে। যা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ।

নদী, বিল ও হাওর-বাঁওড়ের দেশ বাংলাদেশ। মাছ তাই বাঙালির প্রধান খাবারের একটি। হাওর, সেখানকার মাছ ধরা ও জেলেদের জীবন নিয়ে লেখাটিও বাংলার সেই একই রূপের প্রকাশ। নদী নিয়ে এবার আছে কিছু কবিতাও। এছাড়াও আছে নদী-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সাময়িকী নিয়ে আলোচনা।

একুশ, সাতই মার্চ, স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষালোকের এবারের সংখ্যায় প্রতিফলন ঘটেছে এসবের।

এসেছে গ্রামপর্যায়ে বিভিন্ন স্কুলে তৈরি করা সিদীপের মুক্তপাঠাগারের কথা। জীবনসংগ্রামে জয়ী দু'জন কৃষাণীর সাফল্যের গল্প। ৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলনের কথা। আরও নানাবিধ উপকরণ নিয়ে এবারের শিক্ষালোকের আয়োজন। সবার জন্য শুভকামনা।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

জীবনানন্দের ‘নদী’

আমীন আল রশীদ

“ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ঐ যাইছে বহিয়া।
কত শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।
স্রোতস্বিনী বহে ঐ কল কল রবে।
উতরিয়া কত দেশ সমুদ্রেতে যাবে।”
নদী নক্ষত্র মানুষ

জীবনানন্দকে যেসব কারণে প্রকৃতি ও রূপসী বাংলার কবি বলা হয়, তার অন্যতম প্রধান কারণ নদী। বাংলা সাহিত্য তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যে এরকম নদীঅন্তপ্রাণ কবি বিরল।

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নদীর সঙ্গে থেকেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালকেই নদী আছে। মাঝবয়সে লেখা বাংলার অপরূপ রূপে আক্রান্ত 'রূপসী বাংলা'য় তো বটেই। শেষদিকে লেখা কবিতায়ও আছে। যদিও শেষদিকের কবিতায় দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। কিন্তু নদী তাঁকে ছেড়ে যায়নি।

'নদী' শিরোনামেই আমরা তাঁর কবিতা পাচ্ছি অন্তত চারটি। আর শিরোনামে 'নদী' শব্দটি আছে এরকম কবিতা আছে আরও কয়েকটি। যেমন নদী নক্ষত্র মানুষ, রক্ত নদীর তীরে, হেমন্তের নদীর পারে, অনেক নদীর জল। এছাড়া সরাসরি নদীর নামে কবিতাও পাওয়া যায়। যেমন প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালকে আছে 'সিন্ধু', 'সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো' এবং 'অদ্ভুত সিন্ধুর মতো' শিরোনামে তিনটি কবিতা।

১. 'নদী' শিরোনামে যে কবিতাগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে ঐতিহ্য প্রকাশিত জীবনানন্দের রচনাবলির দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৮৩) অন্যান্য কবিতা অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত কবিতাটি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দের প্রথম কাব্য সংকলনে (জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্ভার, রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স ১৯৬৯) 'নদীরা' শিরোনামে ঠাঁই পেয়েছে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কবিতা পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৩ সংখ্যায়। ১৪ লাইনের এই কবিতায় জীবনানন্দ নদীকে প্রাণসর্বস্ব সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। শুরুটা এরকম:

'বঁইচির ঝোপ শুধু শাঁইবাবলার ঝাড়–আম জাম হিজলের বন–
কোথাও অর্জুন গাছ–তাহার সমস্ত ছায়া এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন কথা সারা দিন কহিতেছে অই নদী? –এ নদী কে? ইহার জীবন
হৃদয়ে চমক আনে।'

এখানে তিনি বলছেন, এ নদী কে? মানে নদী এখানে ব্যক্তি, মানুষ। আগের লাইনে বলছেন, 'কোন কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী।' তার মানে নদী কথা বলে। পরের লাইনে বলছেন: 'ইহার জীবন হৃদয়ে চমক আনে।' তার মানে নদীর জীবন আছে, যে জীবন মানুষের হৃদয়ে চমক আনে।

যদিও কবিতার শেষটা বেশ ট্র্যাজিক। লিখেছেন:

'এক দিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর; মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়–শেষ হয়।'

অর্থাৎ মানুষের মন থেকে নদী হারিয়ে গেলে সেই নদীও শেষ হয়ে যায়। যারা নদী দখল করেন, কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলে নদী খুন করেন–জীবনানন্দ বলছেন, তাদের মনের ভেতরে নদী নেই।

দূষণে বিপর্যস্ত গাজীপুরের লবণদহ নদী

২. 'নদী' শিরোনামে আরেকটি কবিতা আছে জীবনানন্দ রচনাবলির তৃতীয় খণ্ডে (পৃ. ১০১) অন্যান্য কবিতা অধ্যায়ে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় ১৩৫৯ সংখ্যায়। ২৭ লাইনের এই কবিতায়ও মানুষের মনের প্রসঙ্গ আছে। মনকে তিনি তুলনা করেছেন নদীর সঙ্গে।

'মনে হয় যেন মানুষের মন তবু
দুই কালো বালুতীর ভেদ করে ফেলে
চলেছে নদীর মতো।'

৩. ধূসর পাণ্ডুলিপি পর্যায়ে লেখা 'নদী' শিরোনামে আরেকটি কবিতা পাওয়া যায়, যেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রচনাবলির চতুর্থ খণ্ডে (পৃ. ৮৬) অন্যান্য কবিতা অধ্যায়ে। 'নদী' শিরোনামে কবিতাগুলোর মধ্যে এটি বহুল পঠিত। বিশেষ করে আবৃত্তিশিল্পীদের খুব পছন্দের একটি কবিতা।

'রাইসর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হল–দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারই পাশে নদী;
নদী, তুমি কোন্ কথা কও?'

এখানেও নদীর কথা বলার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ নদীর যে প্রাণ আছে বা কথা বলার শক্তি আছে, সেই কথা জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছেন প্রায় এক শতাব্দী আগে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০০৯ সালে একটি রায়ে বলেছেন, নদী হচ্ছে লিভিং এনটিটি বা জীবন্ত সত্তা। অতএব মানুষের মতো তারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

নদীকে আরও প্রাণময়, আরও বেশি আপন করতে এই কবিতায় তিনি নদীকে নিজের মেয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন:

'তুমি যেন ছোটো মেয়ে–আমার সে ছোটো মেয়ে;
যত দূর যাই আমি–হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি: আমারই নিজের শিশু সারা দিন
নিজ মনে কথা কয়।'

৪. অনেকটা গানের সুরে লেখা 'নদী' শিরোনামে আরেকটি কবিতা স্থান পেয়েছে রচনাবলির পঞ্চম খণ্ডে (পৃ. ১১৩) অন্যান্য কবিতা অধ্যায়ে। চারটি স্তবকে লেখা ১৬ লাইনের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকার নভেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায়। অর্থাৎ জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষের আগের বছর। কবিতার ভাষা ও লেখার ঢংয়ে মনে হয় এটি তাঁর প্রথম দিককার, অর্থাৎ ঝরাপালক পর্যায়ের কবিতা।

'ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ঐ যাইছে বহিয়া।
কত শত জীবজন্তু বক্ষেতে ধরিয়া।
স্রোতস্বিনী বহে ঐ কল কল রবে।
উতরিয়া কত দেশ সমুদ্রেতে যাবে।'
নদী নক্ষত্র মানুষ

শিরোনামে 'নদী' শব্দটি রয়েছে এরকম যে কয়টি কবিতা পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'নদী নক্ষত্র মানুষ' প্রকাশিত হয় দেশ পত্রিকার

২ আশ্বিন ১৩৬০ সংখ্যায়। জীবনানন্দ যে নদীর নামকরণ করতেন বা ভালোবেসে নদীর নাম দিতেন, সেটি জানা যাচ্ছে এই কবিতায়।

'এখানে জলের পাশে বসবে কি? জলঝিরি এ নদীর নাম;
অপরূপ; আমি তবু ঝাউবনী বলি একে'–আস্তে বললাম।'

জলসিড়ি/কীর্তনখোলা নদী, বরিশাল

প্রসঙ্গত, জলসিড়ি নামে কোনো নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় জলসিড়ির প্রসঙ্গ আছে। গবেষকরা দেখিয়েছেন, জলসিড়ি আসলে জীবনানন্দের জন্মস্থান বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কীর্তনখোলা নদী। জীবনানন্দ ভালোবেসে এই নদীর নাম লিখেছেন জলসিড়ি। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে ঝালকাঠি শহরের পশ্চিম প্রান্তে বয়ে গেছে জীবনানন্দের আরেক ভালোবাসার নদী ধানসিড়ি। ধানসিড়ির সঙ্গে মিল রেখে তিনি হয়তো জলসিড়ি লিখেছেন।

ধানসিড়ি নদী, ঝালকাঠি

এই কবিতায়ও মনের প্রসঙ্গ আছে। 'সে বললে–শেষ সত্য নদী নয়, মন।' অর্থাৎ মানুষের মনকে তিনি নদীর সঙ্গে তুলনা করলেও শেষ সত্য যে মন, সেটি তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কেননা মানুষের মন থেকে নদীরা হারালে নদী শেষ হয়ে যায়। অতএব নদীর সুরক্ষায় তিনি মানুষের মনের ওপরেই জোর দিয়েছেন। কবিতাটি শেষ হয়েছে এভাবে: 'নদী ও এই নারী নিজ বাস্তবতা নিয়ে তন্ময়।' এখানে নদীকে তিনি নারীর সমার্থক করেছেন। নদীও যে নারীর মতো–সে কথা আরও অনেকেই লিখেছেন। অর্থাৎ এখানেও সেই জীবন্ত সত্তা।

হেমন্তের নদীর পারে শিরোনামে নদী আছে, এরকম আরেকটি কবিতা 'হেমন্তের নদীর পারে'। প্রবন্ধ-পত্রিকার মাঘ ১৩৬৮ সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

'মাঝে মাঝে মনে হয়
হেমন্তসন্ধ্যায় এই বৃক্ষদের মুখ দেখে
আবছায়া নদীর দর্পণে:
যে বিতর্ক লোপ পায় বালিকার মেধে
অথবা যুবার চিত্তে অকালজটীর মতো আশ্চর্য নির্বেদে
কিংবা যোদ্ধৃদের প্রাণে সারা দিন বায়ু কুকুরের মতো ঘুরে–
তবু মানুষের সাথে শুক্ল পরিচয় চেয়ে নিশীথের ভূমিকায়
সেই সব চিন্তা এসে পিতাদের হৃদয়ে দাঁড়ায়।'
অনেক নদীর জল

চতুরঙ্গ পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় অনেক নদীর জল।

'অনেক নদীর জল উবে গেছে–
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চলে এল।'

নদীর ভাঙনের কথা জীবনানন্দের আরও অনেক কবিতায় আছে। মুন্সিগঞ্জের (বিক্রমপুর) গাউপাড়া গ্রামে তাঁর পূর্বপুরুষের জন্মভিটাও বিলীন হয়েছে পদ্মার ভাঙনে। সেই ভাঙনের গল্প তিনি শুনেছেন ঠাকুমার কাছে। পরবর্তীকালে লিখেছেন:

'তবু তাহা ভুল জানি–রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা;
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার, আরো ঢের জল, জল আরো।'

পদ্মা নদী, মুন্সীগঞ্জ; এখানে দাঁড়িয়ে দূরে যে জাহাজটি দেখা যাচ্ছে, সেখানেই ছিল জীবনানন্দের পূর্বপুরুষের গাউপাড়া গ্রাম

লেখক: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'জীবনানন্দের মানচিত্র' 'সংবিধানের রাজনৈতিক বিতর্ক', 'সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী: আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক', 'উন্নয়নপাঠ: নদী ও প্রাণ', 'সংবিধান-প্রণেতাগণ' ইত্যাদি।

একুশ আমার অহংকার

মো. মাহবুব হোসেন

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। প্রায় দুইশত বছরের পরাধীনতার গ্লানি মোচনে বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো ভিনদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্বকে চরমভাবে জানান দিতে সক্ষম হয়েছিল বায়ান্ন সালের এ দিনে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবসান হলেও নব্য প্রভুরূপী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটি ছিল চরম প্রতিবাদ। আর এর মূলে ছিল মাতৃভাষা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মচেতনার বিকাশ। এটি ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

একুশে ফেব্রুয়ারি আপাতভাবে একটি তারিখ। এই দিনটির কথা মনে পড়লেই আমাদের মনে পড়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির কথা। কিন্তু প্রশ্ন হলো একুশ কি শুধুই একটি তারিখ? একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির ইতিহাসে শুধু একটি তারিখেই সীমাবদ্ধ নয়। একুশ হলো একটি চেতনার বীজমন্ত্র। একুশকে কেন্দ্র করে এদেশে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে। যার ধারাবাহিকতায় আমাদের ইতিহাসে ঘটে গেছে নানান ঘটনা। ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট, ৫৬-তে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি, ৬৬-এর ছয় দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সর্বোপরি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন মানচিত্রের জন্ম– এসবই একুশের চেতনার ফসল।

আমাদের রাষ্ট্রভাষার এই দাবি ৪৭-এর দেশবিভাগের পর হঠাৎ করে শুরু হয়নি, বরং এর পেছনে রয়েছে বর্ণাঢ্য ইতিহাস। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলা ভাষার দাবিটি প্রথম উঠেছিল ১৯১১ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে। এ সম্মেলনে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষাকে পাঠ্যপুস্তকের ভাষা করার জন্য প্রথম দাবি উত্থাপন করেন। আবার বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা রূপে হিন্দি ভাষার দাবি উত্থাপিত হলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বঙ্গভূমির ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান তুলে ধরেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে তমুদ্দিন মজলিসের মাধ্যমে। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম-এর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণের সহযোগিতায় ভাষা আন্দোলনের এই সংগঠনটি জন্মলাভ করে। তমুদ্দিন মজলিসের মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে ভাষা আন্দোলনে। এ ধারাবাহিকতায়ই গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট এবং প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চ একটি মাইলফলক। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বাধ্য হলেন ৭ দফা চুক্তি করতে। কিন্তু এটি ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর একটি কৌশলমাত্র। কারণ ২১ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে এসে প্রথমত রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং পরবর্তিতে কার্জন হলে আয়োজিত বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" উপস্থিত ছাত্র-জনতা বারবারই তার এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অন্যদিকে সরকার এই দাবিকে রুখে দেয়ার ষড়যন্ত্রে ঢাকা শহরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। এ আন্দোলন দমন করতে পুলিশ মিছিলের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে রফিকউদ্দিন আহমদ, আবুল বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ কয়েকজন শাহাদত বরণ করেন। এছাড়া আহত হন ১৭ জন এবং গ্রেফতার হন ৬২ জন। এ আন্দোলনকে দমনের প্রচেষ্টা তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য বুমেরাং হয়। এ প্রসঙ্গে 'ভাষা আন্দোলনের দলিল ও অন্যান্য' গ্রন্থে আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন, 'তাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্র মানুষের এই অহিংস আন্দোলন দমন করতে লীগ সরকারকে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগাতে হয়। বস্তুত এই পতনোন্মুখ নাজুক অবস্থায় এক মিলিটারি ছাড়া আর কোনো শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিল না।'

আমাদের গর্বের একুশ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার স্মৃতি অঙ্কিত এ দিনটি সংগ্রামের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় উজ্জ্বল এবং রক্তাক্ত আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে এ দিবস। মো. রফিকুল ইসলাম ও মো. আব্দুস সালাম নামক কানাডা প্রবাসী দুই ব্যক্তির উদ্যোগে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের সহযোগিতায় মেলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি আমাদের জাতিসত্তাকে করেছে গৌরবান্বিত।

বাংলা ভাষার যে অর্জন, তা একদিনে সম্ভব হয়নি। হাজার বছরে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যাঙ্গন। বেড়েছে সাহিত্যকর্মী, লেখক ও প্রকাশক। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা; ১৯৬৫ সালে মুনীর অপটিমা বাংলা টাইপরাইটার; ১৯৭২-এ বাংলা বিশ্বকোষ; ১৯৮৭-তে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর আইন; ১৯৯২-এ প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম;

১৯৯৯-এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রাপ্তি; ২০০২-এ সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষার আইন; ২০০৩-এ বাংলাপিডিয়া প্রকাশ প্রভৃতি উদ্যোগ আমাদের বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবুও বাস্তবতা হলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এ ধারায় রয়েছে ছন্দপতন।

বিশ্বায়নের এ যুগে একটি ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা ব্যাপকভাবে নিজের আধিপত্যকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করেছে, এর প্রভাব পড়েছে আমাদের জাতীয় জীবনেও। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট সত্য যে, আমাদের দেশেও ক্রমশ অনেক ক্ষেত্রে বাংলাভাষার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রসার, অফিস-আদালত, ব্যানার-ফেস্টুনসহ যত্রতত্র ইংরেজি ভাষার অবাধ ব্যবহার আমাদের বাংলা ভাষার অবস্থাকে কঙ্কালসার করে ফেলছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে আমি অস্বীকার করছি না। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমনটি বলেছেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শিক্ষার পত্তন।' ঠিক এই কথাটিই আমাদের জাতীয় জীবনে পাথেয় হওয়া উচিত।

পূর্বেই বলেছি ২১ আমাদের জাতীয় জীবনে শুধু একটি গাণিতিক সংখ্যা নয়, কিংবা ইতিহাসের একটি ঘটনা নয়। বিশেষ এ দিনে আবেগঘন কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি গাওয়ার মধ্যে দিয়ে এ দিনের তাৎপর্যকে আটকে ফেলার সুযোগ নেই। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের সময় কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন-

আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখে আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

[কবিতা: ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯]

কবি শামসুর রাহমানের এই আকুতি বর্তমান এখনো। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি; তবুও একুশ আমাদের সেই অবিনাশী চেতনা, যা বুকে লালন করে আজও বাঙালি সন্তান বিপ্লবের সুধায় উজ্জীবিত হয়; আমাদের দেশ ও সমাজকে নতুনভাবে সাজাবার প্রেরণা বারবার ফিরে আসে। আর এ প্রেরণাতেই কালে কালে অন্যায়, শোষণ আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয় বাঙালি সন্তানেরা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, কাশীনাথপুর, পাবনা

মেঘনার চর

হুমায়ূন কবির

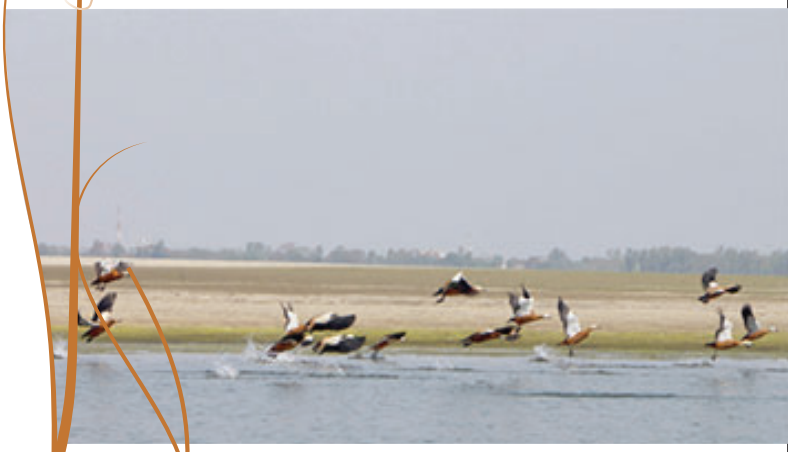

মেঘনা নদীর তীরে তীরে
দেখি সবুজ ঘাস
চরগুলোতে নানা সবজি
করছে কৃষক চাষ।

এক চর থেকে আরেক চরে
গেলাম ডিঙি নায়
বুনোফুলেরা খেলা করে
আপন মনে হায়।

রত্নগর্ভা জন্মভূমি
রত্নে নাই যে ঠাঁই
শিশির কণা দূর্বা ঘাসে
হীরক খণ্ড পাই।

নাই কোলাহল চরের মাঝে
আছে পাখির ডাক
অদূর হতে ভেসে আসে
সন্ধ্যা বেলার শাঁখ।

মেঘনা নদীর তীরে তীরে
কাব্য খুঁজতে যাই
তৃণের কাছে সাতসমুদ্র
শব্দ ভাণ্ডার পাই।

সিদীপ ভবনে

একুশে পদকপ্রাপ্ত আলহাজ্ব রফিক আহামদকে সংবর্ধনা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'মমতা'র প্রধান নির্বাহী জনাব আলহাজ্ব রফিক আহামদ "সমাজসেবা" ক্ষেত্রে একুশে পদক-২০২৪ লাভ করেছেন। তাঁর এই অসামান্য অর্জনের জন্য সিদীপ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে অভিবাদন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব রফিক আহামদসহ মমতা ফাউন্ডেশন-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক, সাধারণ পর্ষদের সদস্য ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় সিদীপে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে সিদীপ। সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সব শাখা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দিনটিকে স্মরণ করে। এ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটায় সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটরিয়ামে শহিদ দিবস ও মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এতে সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীগণ অংশ নেন। মূল আলোচক হিসেবে জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে উল্লেখ করেন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

২১ ফেব্রুয়ারি সকালে সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) নেতৃত্বে সব এনজিও'র অংশগ্রহণে প্রভাতেফেরিতে অংশ নেয় এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে সিদীপ প্রতিনিধি দল জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন।

‘গীতাঞ্জলি’ পাঠাগারের কথা

হাছিনা নার্গিস

মানুষের মন জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী ও আগ্রহী। তার এই অনন্ত জিজ্ঞাসা, অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। আর বই সংগৃহীত থাকে পাঠাগারে। পাঠাগার হলো সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদির এক বিশাল সংগ্রহশালা। পাঠাগারের বইয়ের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে মানবসভ্যতার শত শত বছরের ইতিহাসের হৃদস্পন্দন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়: “এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে।”

সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা: পাঠাগার বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন ১টি বাড়ি বা ঘর, যেখানে বই সংগৃহীত বা সংরক্ষিত থাকে। পাঠাগারের শাব্দিক প্রতিশব্দ হচ্ছে পুস্তকাগার, গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। মানুষের হৃদয়ের উত্থান-পতনের ধ্বনি শোনা যায় এই পাঠাগারেই। পাঠক এখানে স্পর্শ পায় সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের কল্লোল ধ্বনি, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতানের সুর। এই মহা ঐকতানের সুর প্রতিটি সমাজের প্রতিটি মানুষের বা পাঠকের কাছে তুলে ধরে পাঠাগার। প্রতিটি সমাজেই পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের ক্লান্ত, বুভুক্ষু মনকে আনন্দ দেয়। তার জ্ঞান প্রসারে রুচিবোধ জাগ্রত করে। পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে নানা মত ও পথের বই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়: “লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যেদিকে ইচ্ছে ধাবমান হও কোনো বাঁধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।”

সমৃদ্ধ পাঠাগার সব ধরনের পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে অবদান রাখে। বই ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। তাই প্রতিটি সমাজের সমৃদ্ধ পাঠাগারের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাতীয় জীবন গড়ায় সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তব্য- “গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে সংহতি যা দেশ গড়া কিংবা রক্ষার কাজে রাখে অমূল্য অবদান।”

স্থানীয় পাঠাগারটির পরিচিতি: আমার এলাকার পাঠাগারটির নাম গীতাঞ্জলি। পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতার নাম চাঁদ মোহন সরকার। তিনি একে দীর্ঘ সময়ব্যাপী গড়ে তুলেছেন। বলা যায়, উক্ত পাঠাগারটির উদ্যোক্তা বছরের পর বছর অল্প অল্প করে বইগুলো সংগ্রহ করেছেন। পাঠাগারটিতে রয়েছে সাহিত্যের নানা বই। চাঁদ মোহন সরকার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৮৭ ও ১৯৮৯ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ অনার্স ও এমএ সম্পন্ন করেন। তিনি এখন শম্ভুপুরা মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। পাঠাগারটি নিয়ে তার আরো পরিকল্পনা আছে। যার মাধ্যমে তিনি সকলকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করতে চান।

পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠার বছর ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠার বছর ও ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা হল: “ব্যক্তিগত পাঠাগার সাধারণত ব্যক্তির ইচ্ছা ও রুচির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কবে কখন কোন দিন এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ঠিক দিন তারিখ উল্লেখ করে বলা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে বই পড়ার শখ এবং আকাঙ্ক্ষা ছোটবেলা থেকে এবং তা ছিল ধার করে পড়া। কারণ আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু আমার বই কিনে পড়ার মতো অবস্থা ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আমার কেনা প্রথম গল্পের বই ‘ঠাকুমার ঝুলি’ ১৯৮৭ সালে। যদিও বইটি আমার সংগ্রহশালায় নেই। ২য় বইটি হচ্ছে যাযাবরের ‘দৃষ্টিপাত’ যা সংরক্ষিত আছে। ১৯৯০ থেকে ’৯১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পাই। ক্লাসের সময় ব্যতীত বেশিরভাগ সময়েই পাঠাগারে কাটানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই পুস্তক রাশি দেখে আমারও মনে স্বপ্ন জাগে বই সংগ্রহ করার। শুরুও করি। ছাত্রজীবনের অরক্ষিত ও অগোছালো পরিস্থিতির কারণে বেশিরভাগ সংগ্রহই বন্ধু-বান্ধবের পছন্দের শিকারে পরিণত হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করি। ১৯৯৮ সালে থেকেই পুরোদমে শুরু হয় বই পড়া ও সংগ্রহ করা।”

‘গীতাঞ্জলি’ পাঠাগারের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রতি প্রচেষ্টা ছিল দীর্ঘ। বই রক্ষণাবেক্ষন ও সংরক্ষণের সকল কাজ তিনি নিজেই করছেন। পাঠাগারটিতে সমৃদ্ধ বই সংগ্রহের চেষ্টা করছেন এবং প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন যেন ভালো বইয়ের সংগ্রহশালা হিসেবে পাঠাগারটি গড়া যায়।

পাঠাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা: বর্তমান স্কুল কলেজ পড়ুয়া

ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্মার্ট মোবাইল ব্যবহারের আধিক্য দেখা দিচ্ছে । যার ফলে তারা এসবে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই যুবসমাজকে আবার স্বাভাবিক করতে, উন্নত মানসিকতার অধিকারী করতে প্রয়োজন বই পড়া। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই জনাব চাঁদমোহন তার 'গীতাঞ্জলি' পাঠাগারটি সাজিয়েছেন। উনার কাছে বাংলায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য জমা দিয়ে পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ে এবং প্রয়োজনে বাসায়ও নিয়ে যায়। এমন পাঠকের সংখ্যা দৈনিক ৬-১০ জন। আবার কোন কোন সময় কমও হয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ার মাধ্যমে মানসিক বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা: গীতাঞ্জলি পাঠাগারে নানা সমৃদ্ধ বই রয়েছে। এই পাঠাগারে রয়েছে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রায় ৬০৭টি বই। যদিও প্রতিবছরই এর সংখ্যা বাড়ে। পাঠাগারের বইয়ের মধ্যে শরৎ রচনা ১, ২, ৩, বিষাদ সিন্ধু, কালবেলা, নির্বাসন, রবীন্দ্রনাথ রচনাসমগ্র, স্টুডেন্ট হ্যাকস, নেভার স্টপ লার্নিং, ভূত সমগ্র, নিঃসঙ্গ নক্ষত্র, কোরআনসূত্র, মহাভারত, ওয়ার এন্ড পিস, শিল্পী ট্রাজেডি, আই এম মালালা, পৌরাণিক শব্দের উৎস অভিধান, বাংলা একাডেমি বাংলা উচ্চারণ অভিধান, ফ্রিডম্ এট মিডনাইট, মধুসূদন রচনাবলি, প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, মহাত্মা গান্ধী, গোয়েন্দা কাহিনী, ইডিপাস, মেমসাহেব, রবীন্দ্র সংগীত, মানসি, শেক্সপিয়ার রচনাসমগ্র, পথের পাঁচালী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, রোকেয়া রচনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠাগারটিতে কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা: একটি পাঠাগারে যেমন হরেক রকমের বই দরকার তেমনি দরকার হয় বই সংরক্ষণের সুব্যবস্থা। অর্থাৎ বই সংরক্ষণ ও পাঠকের সুবিধামতো নেওয়া ও দেওয়ার তারিখ অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই কাজগুলো করার জন্যও দরকার কর্মচারী। যেহেতু গীতাঞ্জলি পাঠাগারটি এককভাবে জনাব চাঁদমোহন নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই বই আদান-প্রদান সহ সকল দায়িত্ব তিনি নিজেই যত্নের সাথে করে থাকেন। বইয়ের প্রতি ভালবাসা থেকেই তিনি পাঠাগারের প্রতি যত্নশীল। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি এই কাজটি বেছে নিয়েছেন। তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করেন এবং উৎসাহিত করেন বই পড়ার জন্য। এজন্য সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা উনাকে সম্মানের চোখে দেখে ও শ্রদ্ধা করেন।

পাঠাগারটি নিয়ে স্মৃতিচারণ: 'গীতাঞ্জলি' পাঠাগারটিতে এলাকার অনেক অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা বই পড়েন। তাদের এই বিভিন্নমুখী বই পড়া বর্তমানে এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রশংসার দাবি রাখে। লেখক পলাশ আহমেদ, নজরুল ইসলাম, রকিবুল হাসান রাকিব, লেকচারার সালমা সুলতানা

তাদের ভাষায়- বর্তমানে দেশের এমন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের মোবাইল আসক্তি থেকে বাঁচার জন্য ও উন্নত মন-মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসিত। কলেজের ছাত্র রকিবুল হাসান রাকিবের পড়া একটি বই ড. লুৎফুর রহমানের রচনাসমগ্র। এটি পড়ে তা থেকে নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরে আনন্দিত হয় এবং বাস্তব জীবনে বইটি থেকে গ্রহণ করা জ্ঞান বাস্তবমুখী প্রয়োগের জন্য উপযোগী বলে মনে করেছে সে।

উপসংহার: মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাসে পাঠাগার খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মানব হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করে পাঠাগার। প্রকৃত জ্ঞানার্জনের ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সব গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিটি সমাজে যদি একজন করেও চাঁদমোহনের উদ্যোক্তা থাকতো তাহলে উন্নত জাতি ও সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো সম্ভব হতো। আমাদের আড়াইহাজারে মুক্ত ভাবনার পছন্দ অনুযায়ী বই পড়ার মতো সুযোগ করে দেয়ায় 'গীতাঞ্জলি' পাঠাগারের উদ্যোক্তা শিক্ষক চাঁদমোহন কে ধন্যবাদ।

লেখক: সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, আড়াইহাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ

হাওরের মাছ, মাছধরা ও সংস্কৃতি

রঞ্জন মল্লিক

সাধারণভাবে নীচু ভূমির পানি এলাকা, যেসব বিস্তৃত অঞ্চল বছরের সাত থেকে আট মাস পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে ঐসব এলাকাকে হাওর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হাওর বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি জেলায় অবস্থিত।

বাংলাদেশে ছোট বড় হাওরের সংখ্যা সরকারি হিসাব মতে ৩৭৩টি। এরমধ্যে সিলেট জেলায় আছে ১০৫টি, সুনামগঞ্জে ৯৫টি, কিশোরগঞ্জে ৯৭টি, হবিগঞ্জে ১৪টি, নেত্রকোণায় ৫২টি, মৌলভী বাজারে ৩টি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছে ৭টি হাওর। হাওরের আয়তন আট লাখ আটান্ন হাজার চারশত ষাট হেক্টর। বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় একদশমাংশ জায়গা বিস্তৃত হাওর অঞ্চল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাত্রার মানে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি।

বাংলাদেশের হাওরগুলো কৃষি, মৎস্য, জীববৈচিত্র্য ও নানারকম প্রাকৃতিক সম্পদের যেন বিশাল ভাণ্ডার। হাওরে ৭ থেকে ৮ মাস পানি থাকে, বাকী ৫ মাস শুষ্ক থাকে। হাওরে মূলত দুটি ঋতু প্রধান–বর্ষা ও শীত। হাওর বর্ষা মৌসুমে সাগরে পরিণত হয়। তখন হাওরের কূলকিনারা দেখা যায় না। অথৈ পানিতে হাওরগুলো তলিয়ে যায়। বাতাসে ঢেউয়ের দোলায় হাওরের পানি আফাল তোলে। উল্লেখ্য যে, হাওরে তিন-চার ফুট উচ্চতার ঢেউকে আফাল বলে। এ সময় হাওর খুবই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পানির ওপর ছোট ছোট গ্রামগুলো দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে।

হাওরের মাছ ও মাছধরা এই বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে হাওর কি এবং কেন প্রকৃতির এই লীলাখেলা সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে, ইয়োসিন যুগে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ বরাবর একটা কবজা বলয় (Hinge belt) সৃষ্টি হয়, যা নাগা পাহাড়ের ডাউকি চ্যুতির ন্যায় চ্যুতি সৃষ্টি করে। অনেকের মতে, মেঘালয় ও বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর সংঘটিত ডাউকি চ্যুতির কারণে অতি প্রাচীনকালে এলাকাটি ৩ থেকে ১০ মিটার বসে যায়। তারপর ১৭৮৭ সালের বন্যা ও ভূমিকম্পের পর ব্রহ্মপুত্র নদী তার গতিপথ মধুপুর গড়ের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে পরিবর্তন করলে পলিমাটি ভরাট হওয়ার অভাবে এই অঞ্চল আরও নিচু হয়ে যায়। এসব প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে হাওর সৃষ্টি হয়। বিশাল এই জলরাশিকে বিদেশি পর্যটকরা সাগর বলে ভ্রম করতেন। তাছাড়া ভূ-বিজ্ঞানীরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নদী প্রবাহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আরও মন্তব্য করেন, ভারতের অসংখ্য পাহাড়ি নদী হাওর অববাহিকায় পানি সরবরাহ করে। হাওর অববাহিকাটির উত্তরে মেঘালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড় এবং পূর্বদিকে মনিপুরের উচ্চভূমি দিয়ে ঘেরা বিধায় প্রতি বছর মৌসুমী বৃষ্টিপাতে সামান্যতেই প্লাবিত হয়ে যায়। এই প্লাবন তথা নদীবাহিত পলি জমা হয়ে এ অঞ্চলের নিম্ন জলাভূমিতে সাগর সদৃশ হাওর অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে বলেও তাঁরা মনে করেন।

তবে প্রকৃত অর্থে হাওরগুলোর সাথে সিলেট বিভাগের প্রধান ও অপ্রধান সকল নদীরই সরল যোগাযোগ আছে। হাওর ও নদীর অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হাওরবিহীন নদী আছে কিন্তু

নদীবিহীন হাওর একটিও নেই। বলা হয়ে থাকে সুরমা, কুশিয়ারা, সোমেশ্বরী, রত্না, বৌলাই, যাদুকাটা, ঝালকালি, ধামালিয়া, নোয়াগাং, উমিয়াম, ধলাই, পিয়াইন, সারি, বরদল, গোয়াইন, সুনাই, জুরী, মনু, লংলা, বিবিয়ানা, খোয়াই, কালনী, সুতাং–এ নদীগুলো হাওরের প্রাণ হিসেবে বিবেচিত। এই নদীগুলোর সাথে প্রতিটি হাওরেরই জালের মতো সংযোগ আছে। হাওর অঞ্চলসমূহ সাত মাস পর্যন্ত পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ধীরে ধীরে হাওরের পানি নদীতে গড়ায় এবং চারটি মূল নদী তথা উত্তর পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত কুশিয়ার ও সুরমা নদী এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত সোমেশ্বরী ও কংস নদী এই অববাহিকার মধ্য দিয়ে অন্যান্য নদীর সংযোগের মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীতে পতিত হয়। অর্থাৎ সুরমা, কুশিয়ারা, সোমেশ্বরী ও কংস নদীর শাখা-প্রশাখা ও উপনদী বেষ্টিত হাওরাঞ্চলের পানির প্রবাহই মেঘনা নামে যাত্রা করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। মূলত সুরমা ও কুশিয়ারার মিলনস্থল এবং মেঘনার উৎপত্তিস্থলই হাওরের কেন্দ্র বলা যেতে পারে। এই মেঘনা নদী দিয়ে প্রতিমুহূর্তে হাওরের পানি বঙ্গোপসাগরে নির্গত হচ্ছে।

দেশের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত জলাভূমি বা হাওর-বিল এদেশের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিছু জলাভূমিতে সারাবছরই পানি থাকে। অধিকাংশ শীত ও গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়। রাজশাহীর চলন বিল, গোপালগঞ্জের বিল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও শেরপুর জেলার হাওর ও বিল বাংলাদেশের এই বিশেষ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। কেবল ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়–অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলাদেশের হাওর এক বিরাট স্থান দখল করে আছে। বর্ষাকালে বিশাল হাওর এলাকায় অথৈ পানির যৌবন দেখলে সাগর বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এ সময় দ্বীপের মতো গ্রামগুলো ভেসে থাকে অথৈ পানিতে। অথচ শীতকালে সেখানেই বিস্তীর্ণ মাঠভরা ফসলের শ্যামলিমায় মন ভরে যায়। কবি উদাস গলায় গেয়ে ওঠেন '*ও আমার মন মাতানো দেশ।*'

শীত মৌসুমের শুরুতেই নদীর টানে হাওরের জল শুকিয়ে আসতে থাকে। জলাধারগুলো আস্তে আস্তে জেগে ওঠে। তারসাথে জেগে ওঠে বিশাল মৎস্য সম্পদ। তখন হাওর-বিলে মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। বর্ষামৌসুমে যদিও মাছ ধরা হয় তথাপি শীত বা শুষ্ক মৌসুমেই জেলেরা মাছ ধরায় মেতে ওঠেন। এ সময় হাওরের অল্প পানিতে বিশাল আকৃতির বোয়াল, পাঙ্গাস, গজার, শোল, রুই, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া, চিতল ধরা পড়ে। হাওরে বড় বড় মাছের পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির ছোট ছোট মাছ যেমন টেংরা, কই, সরপুঁটি, চান্দা, বাউশ, পাবদা, মেনি, খলিসা, টাকি, চাপিলা, বঁইচা, গুলশা, কাইক্কা, কেচকি, ছোট চিংড়ি, বড় চিংড়ি, গুতুম, কাশ খাউরী, লাচো, দাড়কিনা, ছেলা, কাইল্লা, মহাশোল, ভেদা, বাছা, বাতাসি, বাঘাইর, কুইচ্চা, বাঈম, পটকা, টেপা মাছ প্রধান। মানুষের সীমাহীন লোভ এবং অবিবেচকের মতো মাছ ধরার কারণে বর্তমানে বেশ কিছু মাছ বিলুপ্তির পথে।

বর্ষা ও শীত মৌসুমে হাওর ও বিলগুলো থেকে এসব মাছ জেলেরা তুলে থাকেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় হাওরে মনুষ্য বসতির পর থেকে এ অঞ্চলের সকলেই কমবেশি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন থাকেন। তবে এ অঞ্চলের প্রতিটি জেলাতেই পেশাজীবী মৎস্য শিকারী বা জেলে সম্প্রদায় আছে। পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের জেলেদের আধিক্য ছিল। দেশভাগের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশান্তরিত হওয়ার কারণে জেলেদের সংখ্যা কমে গেলেও এই স্থানটি মুসলিম জেলেরা দখল করে। এদেরকে সাধারণত জোলা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

হাওরের জেলেরা সারা বছরই মাছ ধরার কাজে নিজেদের জড়িয়ে রাখেন। বর্ষাকালে তারা বাড়ির আশপাশে টাঙ্গা জাল পাতেন। তাছাড়া হাওরের গভীরে গিয়েও মৎস্য শিকার করেন। হাওরের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে তারা মাছ শিকার করেন। বর্ষার ভরা মৌসুমে ৮/৯ কেজি ওজনের আইর মাছ এবং ১০/১২ কেজি ওজনের পাঙ্গাস, বোয়াল এবং চিতল মাছ তাদের জালে ধরা পড়ে। এসব মাছ তারা নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ ও ঢাকার বড় বড় বাজারে চালান দেন। হাওরের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে প্রতিবছরই অনেক জেলে প্রাণ হারান, সে খবর খুব কমই মিডিয়াতে আসে। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় হাওরের জেলেদের। হাওরে বড় বড় মাছ মারলেও জেলেরা তাদের অভাব ঘুচাতে পারেন না।

হাওরে মাছ মারার প্রধান উপকরণ হলো জাল, তাছাড়া আছে ভেসাল জাল বা বোয়াল জাল, ধর্ম জাল, ইলসা জাল, পলো, ধরংগা, বিত্তি, টুসি, পাল্লা, চাঁই, গোলচাঁই, বুচনা, বড়াক বাঁশ, টেডা, বর্শা, টেপা ও আইডা। হাওরে জেলেরাই জাল বোনেন, জেলেপত্মী সারা দিনের কাজ শেষে বিকেলে জাল বোনা শুরু করেন। এ কাজে জেলের ছেলে, বুড়ো, কন্যা সকলেই সাহায্য করে। ফলে জেলে জীবনে মাছ ও জাল ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মাছ ধরার সময় জেলেরা নানা সংস্কার মেনে মাছ ধরতে যান। বাড়িতে তারা বিড়াল পালেন। মাছ ধরার দিন বিড়ালকে ভাতের সাথে রান্না করা ভালো একটি মাছের টুকরা দেন। বিড়ালের খাওয়া হলে বিড়ালকে আদর করে পা ছুঁয়ে মাছ মারতে যান। মাছ ধরা শেষে বাড়ি ফিরে আবারও বিড়ালকে ধরা মাছ থেকে একটি মাছ তার পাতে তুলে দেন। মৎস্যজীবীদের ধারণা বিড়ালের একটা সম্মোহনী পাওয়ার বা শক্তি আছে, তাদের আশির্বাদ ও ধ্যানের কারণে জেলেদের জালে বেশি বেশি মাছ পড়ে। তাছাড়া জেলে পরিবারের অনেকে উদ পালেন, যা দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো। এদেরকেও তারা খুব আদর যত্ন করেন। তাছাড়া মাছ মারার আগে তারা গঙ্গার পূজা করেন। গঙ্গা দেবী সন্তুষ্ট থাকলে জালে বেশি বেশি মাছ পড়বে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে গঙ্গা দেবী তাদের রক্ষা করবেন বলেও দৃঢ় বিশ্বাস। তদ্রুপ মুসলিম জেলেরা বদর পীরকে ভক্তি করেন। মাছ ধরার আগে তার নাম উচ্চারণ করেন। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে পতিত হলে বদর পীরের মানত করেন এবং সিন্নি রান্না করে তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

মাছ ধরে ও মাছ বিক্রি করে হাওরের জেলেরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করেন। মাছ ধরা সহজ কাজ নয়। বর্ষাকালে হাওরের বিশালাকৃতির জলাশয় থেকে মাছ মারা খুবই দুঃসাহসের কথা। ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যবহার শুরু হলে হাওরের মৎস্যজীবীদের জীবন রক্ষায় কিছুটা স্বস্তি আসে। আশির দশক থেকে ইঞ্জিন চালিত জেলে নৌকার ব্যবহার শুরু হয়। তার আগে লগি-বৈঠা বা পালতোলা নৌকার সাহায্যে হাওরে মাছ মারা হতো। ফলে ঐ সময় দুর্ঘটনা ঘটতো অনেক বেশি। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে এরা অনেকটা আদিম মানুষের মতোই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। নৌকাডুবি হলে ৮/১০ দিনেও জানা যেত না। ভাগ্যক্রমে কেহ বেঁচে ফিরে এলে তখন জানা যেত নৌকাডুবির ঘটনা। মিঠামনিয়ার অধিবাসী এক জেলে পরিবারের করুণ ইতিহাস হলো মাছ ধরতে গিয়ে একই গ্রামের ৭ জনের সলিল সমাধির কথা। সেদিন ছিল ভরা অমাবস্যা। ভাদ্র মাসের শেষ শনিবার। হাওরের পানি কুলকুল বেগে নদীর দিকে গড়াচ্ছে। স্রোতের টান অনেক। বিকেল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এ সময় হাওরে জাল টানলে বড় বড় মাছ ধরা পড়ে। সেই লোভে এবং অর্থের টানে ৭ জন জোয়ান জেলে সন্ধ্যার আগে নৌকা ও জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তীব্র স্রোতে অমাবস্যার রাতে মাছও পড়ে প্রচুর। জেলেরাও জানে আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাছের উজান চলে হাওরে। সাহস করে জাল নিয়ে নামলে দুই চার দশ হাজার টাকার মাছ মারা সম্ভব। সেদিন রাতে ঐ জেলেরা প্রচুর মাছ মেরেছিল। মাছ ধরার নেশায় তারা ভুলে গিয়েছিল দমকা বাতাসের কথা। গভীর হাওরে হঠাৎ উথাল পাথাল ঢেউ আর বাতাস শুরু হয়। জেলেরা পাত্তা দেয়নি। যখন বাতাসের সাথে ঝড়ো বৃষ্টি শুরু হয় তখন তাদের হুঁশ হয়। তারা বাড়ি ফেরার তাগিদ অনুভব করে। প্রাণপণে বাতাস ও ঢেউ সামলে পথ চলতে শুরু করে। বাতাসের গতিবেগ বাড়তে থাকলে নৌকাকে কোনক্রমেই সামাল দিতে পারছিল না তারা। এক সময় ঝড়ো বাতাসে নৌকাটি উল্টে যায়। সাগরসম সেই গভীর হাওর থেকে ৭ জেলের একজনও ফিরে আসেনি আর কোন দিন। এ কথাগুলো বলছিল গোবিন্দ মাঝির মেয়ে আশালতা বৈদ্য। আশালতার তখন বয়স ছিল ১০ বছর। আশালতা আরও বলেন, টানা চারদিন ছিল ঝড়, তুফান আর আফাল। রাতে ঝড়ের সাথে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পরের দিন অন্য গ্রামে চলে যেতে হয় তাদের। ফলে বাবা বেঁচে আছে না মরে গেছে ঐ সময়ে তারা জানে না। ৬/৭ দিন পর অন্যান্য মানুষের সাথে গ্রামে ফিরে এলে দেখে বাবা ফিরে নাই। সেই রাতে জাল নিয়ে বের হওয়া ৭ মাঝির কেহই ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকেরা মনে করছে ঝড়-বাদলে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ঝড় থামার ১৫ দিন পরেও ৭ মাঝির কেহই ফিরছে না দেখে মাঝি পাড়ায় কান্নার রোল পড়ে যায়। তখন ১০ বছরের আশালতা বুঝতে পারে তার বাবা ঝড়ের তোড়ে হাওরের পানিতে চিরদিনের জন্য তলিয়ে গেছে। বাকী ছয় পরিবারের সদস্যরাও নানা খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হন যে তারা ঝড়ের তোড়ে নিকষ অন্ধকার কালো জলে হারিয়ে গেছেন চিরতরে। একবেলা আধবেলা খেয়ে এ সময় তাদের জীবন কোনমতে চলছিল। পরবর্তী বছরের জুলাই মাসের শুরুতেই হাওরে পাহাড়ি ঢলের তাণ্ডবে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাদের সিন্ধিয়া গ্রামটি। মিঠামনিয়ার মানচিত্রে এই গ্রামটির এখন আর কোন স্থান নেই। হাওরের পানির তাণ্ডবে এভাবে মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে অনেক গ্রাম। হাওরে গ্রাম তলিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। আশালতার পরিবারটি ছিল জেলে পরিবার। এ রকম শত শত জেলে পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে হাওরের বুক থেকে।

কৃষিকাজ ও মাছ ধরা ছাড়া হাওর এলাকায় অন্য কোন কাজের তেমন সুযোগ নেই। বছরের প্রায় ৬/৭ মাস হাওরে যখন পানি থাকে, তখন মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে হাওরের মানুষ। পানি সরে যাওয়ার পর ডিসেম্বর থেকে কৃষিকাজ এবং গো-চারণ শুরু হয়, চলে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এ সময় উচুঁ ভূমি থেকে মানুষ গো-চারণের জন্য তাদের গরু-মহিষ নিয়ে আসে, অনেক আত্মীয় পরিজন তাদের গরু-মহিষ হাওরে স্বজনদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় চারণের জন্য, নিজেরা কাজের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। অন্য দিকে এপ্রিল-মে মাসে ধান কাটা, মাড়াই, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতের কাজে কৃষক ব্যস্ত সময় পার করে। হাওর বর্ষার পানিতে প্লাবিত হলে কৃষকের হাতে আর কোন কাজ থাকে না। ক্রান্তিকালীন এ সময়ে বিশাল জনগোষ্ঠি মানবেতর জীবন কাটায়। অনেকে চড়া সুদে দাদন নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে পতিত হয়। ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারে না হাওরবাসী।

হাওর অঞ্চলের প্লাবন ভূমিসহ মুক্ত জলাশয় মাছের এক বিশাল প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। হাওর যেমন মা মাছের ভাণ্ডার তেমনি জলজ আগাছা ও অন্যান্য জলজ জীবের অভয়াশ্রমও বটে। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক প্রজনন সুযোগ সৃষ্টিতে সারা দেশের মুক্ত জলাশয়গুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে হারাচ্ছে নাব্যতা, বিপন্ন হতে চলেছে সামগ্রিক জীববৈচিত্র্য। বিশ্বের জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের সার্বিক বিপর্যয়ের ৫০% ঘটেছে বিগত ১৯৭১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে। ইতোমধ্যে মিঠাপানির মোট ২৬০টি মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ৬৪টি প্রজাতির মাছ বিপন্ন প্রায় (তথ্যসূত্র: IUCN, ২০১৫)। জলজ উদ্ভিদ ও জলে বসবাসকারী পাখি, বিভিন্ন প্রকার জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বেনথোস ইত্যাদি দিন দিন কমে চলেছে। জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় যদি এভাবে চলতে থাকে তবে হাওরে জলজ জীবের বিলুপ্তির হার স্থলভাগের চেয়ে ৫ গুণ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মৎস্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁদের মতে, হাওরে বসবাসকারী মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

হাওরের প্রধান সম্পদ মাছ এখন আর হাওরের অধিবাসীদের নয়। হাওরের জেলেরা এখন প্রায় নিঃস্ব। মাছ ধরার উপকরণ হারিয়ে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে, মাছ মারার ক্ষেত্র হারিয়ে জেলেরা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। হাওরের মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র হচ্ছে বিলসমূহ। কিন্তু এই বিশাল জলধারা হাওরের জেলেদের জন্য এখন আর উন্মুক্ত নয়। এখান

থেকে মৎস্য আহরণ সরকারি বিধিবিধান মতো হয়। হাওরের বিলগুলো সরকার জলমহাল হিসেবে ইজারা দেয় সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলেদের কাছে। বর্তমানে হাওরসংলগ্ন বিভিন্ন নদীর অংশও জলমহাল হিসেবে চিহ্নিত করে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। এসব জলমহাল ইজারা দিয়ে সরকার প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে। জলমহাল ইজারার নীতিমালা মোতাবেক ২০ একরের উর্ধ্বে জলায়তনসম্পন্ন জলমহাল/বিলগুলো জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ইজারা দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে ভূমি জবরদখল রোধে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির সভায় দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০ একরের উর্ধ্বে আয়তনের জলমহালের তালিকা করা হয়। এই তালিকা ধরে মৎস্যজীবী সংগঠন নামে জলমহাল ইজারা দেওয়া শুরু হয়।

সরকার জলমহালে ক্ষুদ্র মাছচাষীদের বা প্রান্তিক জেলেদের মাছ চাষের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করেছেন। মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ - "মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১১"-এ জলমহালে বা জলাশয়ে মাছ চাষের জন্য ঋণ কর্মসূচিতে বলা হয় - বিধবা, দরিদ্র মহিলা, মৎস্যজীবী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী - মৎস্য চাষের এই অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ভিটেবাড়ি ছাড়া ন্যূনতম ২০ শতাংশ জলাভূমির অধিকারী হতে হবে। এরা ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। গ্রুপের ক্ষেত্রে জলাশয়ের আয়তন দুই একরের বেশি হলে এক লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ অনুমোদন করা যাবে। তিন বছরে ৬টি সমান কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এভাবে সরকার দরিদ্র জেলেদের মাঝে জলমহাল ইজারা এবং হাওর এলাকার ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের ঋণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে হাওরে মৎস্যজীবীদের রক্ষার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে হাওরের জলমহাল ইজারা হাওরের প্রকৃত জেলেরা পান না। এমনকি ক্ষুদ্রঋণও তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ হাওরের মৎস্যজীবীরা অশিক্ষিত, মূর্খ ও কলহপ্রবণ। জলমহাল ইজারা নেওয়ার মতো তাদের আর্থিক সংগতিও নেই। ফলে জলমহাল ইজারা চলে যাচ্ছে ধনিক শ্রেণির হাতে। ধনিক ব্যবসায়ী শ্রেণি হাওরাঞ্চলে মৎস্যজীবী সেজে এবং নীতি নির্ধারকদের করায়ত্ত করে জলমহাল ইজারা নিচ্ছে, ফলে হাওরের প্রকৃত জেলে সম্প্রদায় ইজারা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই জেলেরা ইজারাদারদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছেন। ইজারাদাররা তিন বা পাঁচ বছরের জন্য ছোট-বড় জলমহাল ইজারা নিয়ে প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে হাওরের জেলেদের দিয়ে মাছ মারেন এবং বাজারে মাছ বিক্রি করে প্রচুর সম্পদের মালিক হন। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই বসবাস করছেন। এছাড়া ইজারাদাররা বেশি মৎস্য আহরণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অপেশাদার জেলেদের এনে মাছ শিকার করছে। এসব জেলেরা কারেন্ট জাল ব্যবহার করে রেনুপোনা সহ জলের সব মাছ ধরে ফেলে। ফলে মাছের প্রজননক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী বছর মাছের উৎপাদন কম হয়। এভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। বিপন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।

আলোচিত সাতটি জেলার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাওরের মাছ মারার চিত্র তুলে ধরা হলো। মাছের জন্য বিখ্যাত এমন কয়েকটি হাওরের মধ্যে টাঙ্গুয়ার হাওর বিখ্যাত। কথিত আছে 'ছয় কুড়ি কান্দা আর নয় কুড়ি বিল' নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর। এই হাওর সবচেয়ে গভীর ও বড় তাই এর নাম 'টানগুয়া' এবং এ থেকে টাঙ্গুয়া শব্দে রূপান্তর। পাহাড়ি ঢলে সব হাওরের পানি ঘোলা হলেও টাঙ্গুয়ার পানি ঘোলা হয় না। এই হাওরের পাখি ও মাছ অনেক বড়। এই হাওর প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ। ১৯৫০ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত টাঙ্গুয়ার হাওর ময়মনসিংহের গৌরীপুর জমিদারের মালিকানাধীন ছিল। ১৯৩০ সালের দিকে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর নিবাসী শ্রী মহানন্দ দাশ এটি গৌরীপুর জমিদারের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত বা ইজারা নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দিয়ে হাওরটি মাছ চাষের উপযোগী করে তোলেন। প্রজাস্বত্ব আইন বিলুপ্তির পর টাঙ্গুয়ার হাওর সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে। টাঙ্গুয়ার হাওরের সাথে যুক্ত নদীগুলো হলো সোমেশ্বরী, রক্তি, পাটরাই, কংস, ধামলিয়া, বৌলাই, ধনু এবং সুরমা। তাছাড়া এ হাওরের সাথে যুক্ত রয়েছে সীমান্তের ওপার থেকে প্রবাহিত পাহাড়ি একাধিক ঝর্নাধারা। ১৯৯৯ সালের ১৯ এপ্রিল টাঙ্গুয়াকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়। তখন হাওরটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ২০০০ সালের ২০ জানুয়ারি টাঙ্গুয়ার হাওরকে সুন্দরবনের পর দেশের দ্বিতীয় 'রামসার এলাকা' ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে এটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন। রামসার নীতি অনুসারে এটি জনগণকে সম্পৃক্ত করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। সেই লক্ষ্যে হাওরের পানি সংরক্ষণ, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণী ও অতিথি পাখিদের নিরাপদ আবাস তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। টাঙ্গুয়ার হাওর তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলার চারটি ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তৃত। ৪৬টি গ্রামসহ পুরো হাওর এলাকার আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটার।

এই হাওর দেশের মৎস্য সম্পদের একটি অন্যতম উৎস। স্মরণাতীত কাল থেকে এ হাওর মাছের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। ৫১টি বিল নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর গঠিত। প্রাক্তন ইজারাদারদের তথ্যমতে টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে মাছ ধরার মৌসুমে প্রায় দশ কোটি টাকার মাছ বিক্রি করা সম্ভব। তথ্যটি অনেকাংশেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৬ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে একটি জরিপ চালানো হয়। হাতিরগোদা, রুপাবৈ, রৌয়া, লেচুয়ামারা, বালুরডোবা ও তেঘনিয়া – টাঙ্গুয়ার হাওরের এই ৬টি পয়েন্টে ৬ প্রজাতির মাছ ধরা হয়। জরিপে দেখা যায় হাওরে বিক্রি উপযোগি মাছ আছে ৫,৬০০ মেট্রিক টন, যার বাজারমূল্য ১৯০ কোটি টাকা। তাছাড়া হাওরের বিদ্যমান অন্যান্য প্রজাতির মাছের হিসেব করলে তার বাজারমূল্য ৩০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়। এই হাওরের সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো গ্রাম আছে, যাদের জীবিকার একটি অংশ আসে মাছ ধরা থেকে।

ডেকর হাওর: এই হাওরটি সুনামগঞ্জ সদরের পূর্বদিকে অবস্থিত। হাওরটি জনবহুল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই চাষের জমি নেই। ডেকর হাওরের জমিগুলোর মালিক শহরবাসী। ভূমিহীন হিসেবে তারা অন্যের জমি চাষাবাদ করে। অপরদিকে ডেকর হাওরের বিলগুলো লিজ দেওয়ার কারণে গ্রামের মৎস্যজীবীরা এখানে মাছ ধরার সুযোগ পায় না। বর্ষার মৌসুমেও মাছ ধরতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে জেলেরা মাছ ধরার পেশা পরিবর্তন করছে। শহরে এসে এরা কামলা খাটে, রিকশা চালায়।

শনির হাওর: তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ উপজেলায় বিস্তৃত এই হাওরটি। হাওরের চতুর্দিকে ৫০ থেকে ৫৫টি গ্রাম আছে। শনির হাওরের অধিকাংশ বিল ইজারাভুক্ত। ফলে মাছ ধরা গ্রামবাসীদের জন্য নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র বর্ষা কালে বাড়ির আশেপাশে মাছ মারতে পারে। তবে এই মাছ ধরাও নির্বিঘ্ন নয়। মাঝেমধ্যেই ইজারাদারের লোকরা মাছ ধরায় বাধা দেয়, জাল কেড়ে নেয়, অনেক সময় মারধরও করে।

করচার হাওর: এই হাওরটি সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। সুনামগঞ্জ সদর থেকে এই হাওরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। শুষ্ক মৌসুমে সুনামগঞ্জ থেকে পায়ে হেঁটে, রিকসায় বা মোটর সাইকেলে যাতায়াত করা যায়। এপ্রিল থেকে অক্টোবর এই সাতমাস নদী পথই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। পূর্বে এই গ্রামের সাধারণ মানুষ ছয় মাস কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকতেন আর বাকী ছয় মাস হাওরে মাছ ধরতেন। করচার হাওর মৎস্য সম্পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই হাওরে নানা প্রজাতির প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে লিজ প্রথার কারণে এই সম্পদে গ্রামবাসীদের কোন অধিকার নেই। জেলে সম্প্রদায়ের এখন আর হাওরে মাছ ধরার অধিকার নেই। বিল ইজারার শর্ত মতে ইজারাকৃত বিলের বাইরের তিনশত গজ পর্যন্ত বাইরের লোকের মাছ ধরা নিষিদ্ধ। সংবাদে প্রকাশ– ২০০৫ সালের ১৮ অক্টোবর মাছ ধরা নিয়ে ইজারাদারের সাথে গ্রামবাসীদের এক সংঘর্ষে ৫ জন গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ হন। ২০০৬ সালে ইজারাদারের দায়ের করা মামলায় আসামী ধরতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে পুলিশসহ প্রায় দুইশত লোক আহত হয়। মাছ ধরা নিয়ে হাওর এখন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

ছায়ার হাওর: ছায়ার হাওর দিরাই উপজেলার পশ্চিম ও দক্ষিণে এবং সাল্লা উপজেলার উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থিত। হাওরের পশ্চিমে সুরমা নদী ও পূর্ব দিকে দিরাই নদী। এই দুই নদীর পানিই হাওরের পানির প্রধান উৎস। এই হাওরের প্রধান ও একমাত্র ফসল বোরো ধানের চাষ। কৃষক পরিবারগুলোর ফসল না তোলা পর্যন্ত কোন ভরসা থাকে না। শিলা বৃষ্টি বা আগাম বন্যায় কমবেশি ফসল নষ্ট হলে গ্রামের সবাই তখন মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়তো। মাছ বিক্রি করে খাবার জোটাত। এখন হাওরের লিজ প্রথার কারণে বর্ষা মৌসুমেও জেলেরা হাওরে মাছ ধরতে পারে না। মাছ ধরতে গেলে লিজ মালিকের লাঠিয়াল বাহিনী তাড়া করে গ্রামবাসীর নৌকা ও জাল কেড়ে নেয়।

টেম্পির হাওর: এই হাওরটি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই হাওরের চারপাশে ১৩টি গ্রাম আছে। হাওরের পশ্চিম পাশ দিয়ে কালনী নদী এবং পূর্ব পাশ দিয়ে মহসীন নদী বেষ্টিত। গ্রামবাসীদের তথ্যমতে, অতীতে এই হাওরে অনেক বন ও প্রচুর মাছ ছিল। সারা বছর মাছ ধরে সংসার চালাতো তারা। কিন্তু হাওরে ইজারাদারের প্রবেশের কারণে গ্রামবাসীরা এখন আর মাছ মারতে পারে না। গ্রামবাসীদের ভাষ্যমতে, এখন হাওরে লুকিয়ে মাছ ধরতে হয়। নিজের জমিতেও মাছ ধরতে পারে না তারা। বিল ইজারা পদ্ধতি তাদের জন্য মরণফাঁদ। কিন্তু বাঁচতে হলে মাছ ধরার কোন বিকল্প নেই।

হাকালুকির হাওর: বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাওরের নাম হাকালুকির হাওর। এই হাওরটি মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি হাওর। তিনটি বিশাল পাহাড় এই হাওরের সাথে সংযুক্ত। হাওরের পশ্চিমে ভাটেরা পাহাড় এবং পূর্বে পাথালিয়া ও মধাব পাহাড়। ৫টি উপজেলা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে এই হাওরের আয়তন ১৮১.১৫ বর্গ কিলোমিটার। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালে হাকালুকি হাওরকে 'পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা' ঘোষণা করে। উল্লেখ্য যে ২৩৫টিরও বেশি বিল নিয়ে এই হাওরটি গঠিত।

হাকালুকি হাওর প্রচুর মৎস্য সম্পদে ভরপুর। এই হাওরকে মিঠা পানির মৎস্য ভাণ্ডারও বলা হয়ে থাকে। হাওরের বিলগুলো অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রাকৃতিক আবাস। এখানে বিভিন্ন বিরল প্রজাতির মাছ রয়েছে। এই হাওর এলাকায় পেশাদার জেলে, মৌসুমী জেলে ও খোরাকি জেলেদের বসবাস রয়েছে।

কির্তনখোলা হাওর: খালিয়াজুরি এলাকায় কির্তনখোলা হাওরের অবস্থান। মাছ ধরা ও ধানচাষ এই হাওরের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। কিন্তু এই হাওরের ২৫ ভাগ জমি হাওরের স্থানীয় কৃষকের আর বাকী সব জমি বাইরের ধনী মানুষের। হাওরের বাহিরের লোকেরা এসে ধান চাষ করে আবার বিলগুলো ইজারার কারণেও বাহিরের দাদনদারদের কাছে হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফলে মাছ ধরার জন্য হাওরে নামলে তাদের জাল-নৌকা কেড়ে নেওয়া হয়। এই হাওরের নয়াপাড়া গ্রামে ৩০০ জেলে পরিবার বাস করে। মাছ ধরাই তাদের একমাত্র পেশা। জেলেরা জানান যে, ইজারাদারদের ৫০০০ টাকা জমা দিয়ে ধনু নদীতে মাছ ধরতে হয়। এভাবে নদী ও জলমহাল পেশাদার সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে।

প্রবন্ধে আমি মাত্র গুটি কয়েক হাওরে জেলেদের মাছ ধরার চিত্র তুলে ধরলাম। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের প্রতিটি হাওরের চিত্রই একই রকম। হাওর-জলাভূমি এখন আর জেলেদের হাতে নেই। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ প্রান্তিক চাষীদের হাত থেকে চলে গেছে ধনিক বণিকশ্রেণির হাতে। ফলে হাওরের মানুষ ও পেশাজীবী জেলেরা দিনদিন গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাঙালির পুষ্টি যোগানের ক্ষেত্রে ধানচাষী ও জেলের কৃতিত্ব সমান। এরপরও তাদের সমাজে কোন স্বীকৃতি নেই। বরং মোক্ষম গালিটা তাদের জন্যে নির্ধারিত। হাইল্যার ছেলে, জাইল্যার পুত–গালি হিসেবে সমাজের নানাস্তরে বহুলভাবে ব্যবহৃত।

হাওরের জলশস্যে একসময় জেলেদের জীবন ভরে উঠতো। ধৃত মাছের টাকায় তারা জীবন চালাতো, সন্তানদের বিয়ে দিতো, ঘরবাড়ি বাঁধতো, জাল-নৌকা ও অন্যান্য উপকরণ কিনতো, কিন্তু আজ তারা সেই সুখ ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ইজারাদারদের কারণে হাওর আজ মাছশূন্য। তাদের লোভের কারণে হাওরের মাছ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই আজ জেলেরা কুঁচকো মাছ সংগ্রহের জন্যে হুরিজাল, টাইঙ্গা জাল কাঁধে নিয়ে খানাখন্দ চষে বেড়াচ্ছে। ইজারাদাররা জেলেদের পথে বসানোর জন্যে, তাদেরকে একরকম নির্জীব করে রাখার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করছে। তারা হাওরের বাহিরের জেলেদের ভাড়া করে আনছে। মাছ মারার সকল উপকরণ কিনে মাছ ধরার কাজে তাদের নিয়োজিত করছে। এসব দাদনদারদের অর্থ ও পেশীশক্তির কাছে হাওরের প্রকৃত জেলেরা একেবারেই অসহায়। আবার হাওরের জেলেরা নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের অনৈক্য তাদের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলছে। ফলে বাহিরের অশুভ শক্তি জেলেদের অনৈক্যকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তুলে নিচ্ছে। এই অশুভ শক্তি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন দলের (যখন যে দল ক্ষমতায়) পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছে বহুকাল ধরে। ফলে হাওরের প্রকৃত জেলেরা মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে হাওরের জেলেদের মধ্যে অনেকে পেশা পরিবর্তন করে শহরে গিয়ে রিকসা চালায় বা নানাবিধ কাছে জড়িয়ে পড়ছে। হাওরের জেলেদের নিজস্ব ব্যবসা বলে এখন আর কিছু নেই। মাছ ধরার উপকরণ হারিয়ে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে, মাছ মারার ক্ষেত্র হারিয়ে জেলেরা আজ ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

কী এক দুর্বোধ্য কারণে শিক্ষা জেলে সমাজে কোনো কালেই মর্যাদা পায়নি। কথায় বলে– মানুষ দেখে শেখে। কিন্তু এই কথাটি শিক্ষার বেলায় জেলেদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। পার্শ্ববর্তী হিন্দু-মুসলিম সমাজের সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে, শিক্ষার স্পর্শে এই দুই সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে জেলে সমাজ নির্বিকার। অর্থনৈতিক দুর্বিষহতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা গ্রহণ। এই ব্যাপারটি জেলেরা দেখে শিখতে নারাজ। তাদের বিশ্বাস শিক্ষা নিকট আত্মীয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, আপনকে পর করে ছাড়ে। তাদের এই বিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়। আজকাল জেলে সমাজে যে দু'চার জন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে, তাদের অধিকাংশই মা, বাবা, ভাই, বোনদের ত্যাগ করে শহরবাসী হচ্ছে। স্ব-সম্প্রদায়ের অল্প শিক্ষিত মেয়েকে এরা বিয়ে করতে নারাজ। এরা বিয়ে করছে বর্ণহিন্দু সমাজের কোন উচ্চ শিক্ষিত কন্যাকে। অন্য সমাজে বিয়ে করার কারণে বর পাচ্ছে না শ্বশুর বাড়িতে যথাযথ মর্যাদা। আবার কনের কাছে শ্বশুর-শাশুড়িরা পাচ্ছে না আন্তরিকতা। তাদের অবহেলার কারণে মা-বাবার মনে প্রচণ্ড এক ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে। তারা ভাবছে নিজ সন্তানকে পড়ালেখা করানোর কারণে আজ সে তাদের কাছে অন্য গ্রহের মানুষ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত পুত্র কখনো মা-বাবাকে ত্যাগ করতো না, তাদের ভুলতো না। প্রধানত এই কারণে জেলেরা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে খুব বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে না আজও।

জেলে সমাজে অশিক্ষার দ্যোর্দণ্ড প্রতাপ। অভাব তাদের ক্ষুদ্রতাকে বলবান করে। হিংসা-দ্বেষ এই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দলাদলি কখনো কখনো রক্তারক্তি পর্যন্ত গড়ায়। এত সবের পরেও জেলেরা একত্রিত হয়ে গঙ্গাপূজা, মনসা পূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে, পহেলা বৈশাখে জেলেরা নিজেদের ঐতিহ্যকে খুঁজে ফিরে। এই সকল পূজা পার্বণ-উৎসব প্রান্তিক জেলে গোষ্ঠীকে এখনো একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে সত্য কিন্তু হাওরের মাছ মারার অধিকার হারিয়ে তারা নিঃস্ব হচ্ছে দিনদিন।

তাই হাওরকে বাঁচাতে হলে, হাওরকে মাছের অভয়ারণ্য করে গড়ে তুলতে হলে হাওরের অধিবাসীদের চাহিদার মূল্যায়ন করতে হবে। জাল যার জলা তার– এই নীতিতে বিশ্বাসী হতে হবে।

হাওরের সংস্কৃতি

হাওরের সংস্কৃতি অনেক প্রাচীন। বিশেষ করে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়। হাওর সংস্কৃতির মূলে রয়েছে এর ভূ-প্রকৃতি তথা পাহাড়-টিলা, নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ইত্যাদির বিন্যাস। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সেখানকার জনগণের বিশ্বাস-সংস্কার, আর্থ-সামাজিক ও নৃ-তাত্ত্বিক জীবনপ্রবাহ। পানিবেষ্টিত এই লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, গ্রামীণ লোকাচার, আবেগ-অনুভূতি, শ্রেণিচেতনা তথা জীবনধারার এই অতি সাধারণ বিষয়গুলো তাদের ঐতিহ্যগত লোকগাথায় বা গীতিকায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গীতিকাগুলো মূলত সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন। তাঁর আবিস্মরণীয় গ্রন্থ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা। এতে ৫৫টি গীত সংকলন করেছেন তিনি। পূর্ব ময়মনসিংহের বিল-ঝিল, দিগন্ত বিস্তৃত হাওর, সুজলা-সুফলা মাটি ও সবুজ অরণ্যাদিবেষ্টিত নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এবং সদরের নান্দাইল ও কিশোরগঞ্জের কিয়দংশই ময়মনসিংহ গীতিকায় উঠে এসেছে। এখানে মূলত হাওর অঞ্চলের গল্পগাথা স্থান পেয়েছে। লোকসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় কোন এক স্থানের লোকসাহিত্য শুধু সেই স্থানের আঞ্চলিক লোকমানসেরই সৃষ্টি নয়। আঞ্চলিক লোকসাহিত্য পরবর্তীকালের সমাজ এবং জাতির সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মহুয়া পালাটি ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'তখন থেকে সাড়ে তিনশত বছর আগে রচিত হয়েছিল। এর রচয়িতার নাম ছিল দ্বিজ কানাই।' পালাটিতে যেসব স্থানের নাম আছে তা আজও পূর্ব ময়মনসিংহের নেত্রকোণা অঞ্চলে বিরাজিত। কাজেই মনে হয় আমাদের এই অবিস্মরণীয় প্রেমের গাথাটির কাহিনী সত্য। পাশাপাশি হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বসবাস ছিল, যা এখনো আছে। দ্বিজ ব্রাহ্মণ নমঃশুদ্রের ব্রাহ্মণ, তাই তার বাড়িও ঐ সব অঞ্চলে হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। মহুয়াতে সাপুড়ে, বেদে নৌকা এবং বেদে নৌকার বহর, নোঙর করা ইত্যাদি হাওর বা নদীবহুল অঞ্চলেরই সাক্ষী বহন করে। এখানে অতি সাধারণ মানুষের জীবন-যৌবন, সংগ্রাম, প্রেম-ভালোবাসা এবং প্রেমের প্রতি অঙ্গীকার ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়, যা অনেকটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরও ইঙ্গিত বহন করে বলে সাহিত্যিকরা মনে করেন। হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে স্বাধীন প্রেম, ইচ্ছা মতো বর গ্রহণ, বয়সকালে

বিবাহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এখনো দেখা যায়। তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল কামরুপ-কামাখ্যার প্রাগজ্যোতিষ পুরুষেরও অংশ ছিল যেখানে মাতৃতান্ত্রিকতাই ছিল সামাজিক রীতি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রেম অরণ্য পুষ্পের মতোই পবিত্র। সেখানে বিবাহের চেয়েও বড় হলো প্রেম বা Selection of Partner। নায়িকা মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, লীলা এই প্রেমের কাছে সবকিছু সমর্পন করে দিয়েছেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহুয়া পালার বিবরণ লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "বহু কষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গীতিবর্ণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট – রহমতপুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে 'তালার হাওর' নামক বিস্তৃত হাওর – ইহারই পূর্বে বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুর বাড়ির ভিটা, উলুয়া কান্দি প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশূন্য হইয়া রাজকুমার ও মহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতগুলো ভিটামাটি পড়িয়াছে। কিন্তু নিকটবর্তী গ্রামসমূহে এই প্রণয়ী যুগ্মের বিষয় লইয়া নানা কিংবদন্তী এখনো লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে।" ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নেত্রকোণার হাওর অঞ্চল থেকেই মহুয়া গীত কাব্যের উদ্ভব – যা বাংলা সাহিত্যের অমর কাব্য।

হাওরের সংস্কৃতির মধ্যে পুঁথি পাঠ খুবই প্রাচীন। পুঁথি সাহিত্য কবি বা কবিয়ালরা রচনা করেন। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এই কবিয়ালদের গুরুত্ব খুব বেশি না। কিন্তু এই কবিয়ালরা হাওরের মানুষকে বিনোদন দিয়ে আসছেন হাজারো বছর ধরে। এরা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং সৌখিন হন। বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ ৭/৮মাস মূলত হাওরের কৃষকদের কাজ থাকে না। এই অখণ্ড অবসরকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে বিনোদনের ব্যবস্থা করা যায় সেটাই ছিলো কবিয়ালদের উদ্দেশ্য। তাই তারা মনসার চরিত্র পুঁথিপাঠে নিয়ে আসেন। গাজীকালুর চরিত্র পুঁথিতে রচনা করেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকাহিনী পুঁথি সাহিত্যে নিয়ে আসেন। ফলে অখণ্ড অবসরকে কাজে লাগিয়ে তারা সংস্কৃতির জাগরণ তোলেন।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, দৈহিক কামনা-বাসনা খুব বেশিক্ষণ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষের অন্তরের ক্ষুধা মিটাতে শিল্প সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে হয়। সেই রসকলার সাধনা করেছেন হাওরের গায়েনরা। এরা হাওরের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিল্পের সৃষ্টি করেছেন। ফলে রচিত হয়েছে কালজয়ী পুঁথি সাহিত্য। যা হাওর জীবনের বিনোদনের বিশেষ অংশ। স্যাটেলাইটের এই যুগেও প্রতিটি গ্রামে রাতে পুঁথিপাঠ হয়, মানুষ মন দিয়ে শুনেন, উচ্ছ্বাসে অনেকে হেসে গড়াগড়ি দেন, আবেগে অনেকে চোখের পানি ফেলেন। মূলত পুঁথিপাঠ গণশিক্ষারই একটি অংশ। আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, ভাবুক ও তত্ত্বজ্ঞানী স্বশিক্ষিত মনীষীরা এই পুঁথিসাহিত্যে তাঁদের মেধা ও মননের পরিচর্যা করেছেন।

যাত্রা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। হাওরে যাত্রার সংস্কৃতি আছে। নানারূপ চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, নানারকম বিপর্যয় আর সংঘাতের ভিতর দিয়ে হাওরের জীবনধারা তার স্বরূপ বদলে এগিয়ে চলেছে। জীবন যত বদলেছে তার রূপায়ণে সংস্কৃতিও বদলেছে। শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি আছে কিন্তু মানসিক ক্ষুধার তো পরিতৃপ্তি নেই। খাদ্যে এ ক্ষুধা আরো বাড়ে। ফলে মানুষের খাদ্য মূলত বদলানো না গেলেও মনের খোরাক ক্রমে বদলে যেতে থাকলো। মানসিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির সন্ধানে মানুষ ক্রমশ একদিন গল্প বলা আর গল্প শোনা থেকে কল্পনাকে দেখতে চাইলো, ক্রমান্বয়ে জন্ম নিল ছবি আঁকা, জন্ম নিল নৃত্যকলা, জন্ম নিল সুর ও গান। তাতেও মানুষ থামলো না। কল্পনাকে সে ধরতে চাইলো। মানুষ ধীরে ধীরে কল্পনা থেকে আপন জীবনের ভেতরে খুঁজতে চাইলো মানসিক অতৃপ্তির মুক্তি। এই যে জীবনের গভীরেই জীবনের মুক্তি খোঁজার স্পৃহার একটি প্রচেষ্টা, একটি চিন্তা – তারই অভিঘাতে হাওরে দেখা দিয়েছিল নতুন শিল্পকলা তথা যাত্রাগান। মানুষ যেখানে যে জাতিতেই থাকুক না কেন, মানুষের মূল চিন্তা, মূল বেদনা, মূল তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা চিরকালই এক। তাই সব জাতিতেই মানুষের গল্প শোনার, গল্প বলার , কল্পনার, জীবনের রূপায়ণের স্পৃহা আছে – চেষ্টা আছে। এর উপর নির্ভর করে হাওর এলাকার মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি যাত্রাপালার জন্ম দিয়েছে। যাত্রাপালায় তাদের সমকালীন জীবন কথা বলে, সমকালীন সমাজ কথা বলে, মানুষ কথা বলে এবং সমকালীন ধ্যান-ধারণা কথা বলে। তাই যাত্রাপালাগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। শীত মৌসুমে প্রতিরাত্রে যাত্রাপালার আয়োজন থাকে হাওর এলাকায়।

হাওরের কোন কোন অঞ্চলে অষ্টক গান হয়। এই গান খুবই জনপ্রিয়। তথ্যমতে ষোড়শ শতাব্দীতে আট জন বৈষ্ণব সাধু বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে গান রচনা করেন। হাওর অঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সেই সময়ে বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসেন। বৈষ্ণব গোসাইদের অনেকেই সেইসব গান রপ্ত করেছিলেন। তারা ভাটি অঞ্চলের শিষ্যদের বাড়ি এলে গানের আসর বসাতেন, সেই থেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিরহের কাহিনী নিয়ে অষ্টক গানের সূচনা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম সিলেটের ভাটি অঞ্চলে, তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। অষ্টক গানে বৈষ্ণব প্রভাব থাকা তাই স্বাভাবিক। রাধা-কৃষ্ণের মিলন-বিরহ, শ্রীকৃষ্ণের সখী চরিত্র এবং চিরায়ত প্রেম-ভালোবাসার গান অষ্টক গানে স্থান পেয়েছে। অষ্টক গান হাওর অঞ্চলে যাঁরা এনেছিলেন, তাঁরা হলেন কুন্তন দাস, কৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস, চতুর্ভজ দাস, চিৎস্বামী, নন্দ দাস, পরমানন্দ দাস ও সুর দাস। এই আট জনের সমগ্র রচনা অষ্টছাপ হিসেবে পরিচিত। অষ্টক গানের দলে ৮/৯ জন থাকেন। ঢোল, কত্তাল, মৃদঙ্গ ও বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একটি কাহিনী চরিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই গান গাওয়া হয়। অষ্টক গানে মূল গায়কের সাথে ২/৩ জন দোহারও থাকেন, তারা গানের জলসাকে মাতিয়ে রাখেন। মূলত বাদ্যের তালে তালে লোকজ মুদ্রায় নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে এই গান পরিবেশন করা হয়। শীত-বর্ষা উভয় ঋতুতেই হাওর অঞ্চলে অষ্টক গানের আসর বসে।

ঘাটুগান এ অঞ্চলের লোকসংগীতের এক বিশেষ ধারা। সিলেট

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটে উল্লেখ আছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে হবিগঞ্জ মহকুমাধীন আজমিরিগঞ্জ থানায় জনৈক আচার্যের হাত ধরে এ গানের যাত্রা শুরু হয়। আচার্য তৎকালিন সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই মূলত এ গান রচনা করেছেন বলে গবেষকরা মনে করেন। ছোট ছোট বালকদের নাচগান শিক্ষা দিয়ে বাজনা সংযোগে এক প্রকার চুটকি (ছোট) গান করা হয়। এসব গান অনেকটা হাস্যরসাত্মক তবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাই মুখ্য উপজীব্য। গানে বৈষ্ণব প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ঘাটু গানে কথার চাইতে সুরের প্রভাব বেশি। এ গানে প্রেমের কথা বলা হয়, কিন্তু শেষ পরণতি হয় বিরহে। সমবেত সংগীতের সময় ঘাটুনৃত্যের মধ্যদিয়ে সংগীতের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। গানের তালে তালে সুদর্শন বালকরা নৃত্য পরিবেশন করে।

প্রথমে এলাকার বিত্তবানরা এবং ইংরেজ আমলে জমিদাররা এসব গানের সমঝদার ছিলেন। বিশেষ উৎসবে তাঁদের বাড়ির উঠানে ঘাটু গানের আয়োজন করা হতো। ঘাটুগান উপলক্ষ্যে হাওর এলাকায় সাজ সাজ রব উঠতো। আমাদের বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদ এ গানকে উপজীব্য করে নির্মাণ করেছেন চলচ্চিত্র ঘেটুপুত্র কমলা।

হজরত শাহজালাল (রাঃ) কর্তৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের পর ধীরে ধীরে এ অঞ্চলগুলোতে মুসলিম প্রভাব বিস্তার হতে থাকে। তবে এখানে ইসলাম সুফি সাধকদের মাধ্যমেই বিস্তার ঘটে। সুফি সাধকরা গান-বাজনার মধ্যদিয়ে মানুষের অন্তরে স্থান করে নেন। জারি বা মর্শিয়া গান তাদের হাত ধরেই আসে। মহানবীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হোসেন এবং তাঁদের পরিবার কারবালা প্রান্তরে যে করুণ পরিণতির শিকার হন সেইসব শোকগাথা নিয়েই মূলত জারি বা মর্শিয়া গান রচিত। জারি গানে একজন বয়াতি বা গায়েন গান পরিবেশন করেন। তার সহযোগী কিছু লোক ধুয়া গেয়ে তাকে সহযোগিতা করে থাকেন। এ গানগুলো হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসবে বয়াতিরা তাদের দলবল সহযোগে পরিবেশন করেন। এতে মারফতি-মুর্শিদি তত্ত্ব সহ নানাবিধ ধর্মতত্ত্বও আলোচিত হয়। তখন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র সবমিলে ধর্ম হয়ে যায় মানবধর্ম। এই সংগীতের আসর যেন সকল ধর্মের মিলন মেলায় পরিণত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অষ্টগ্রাম, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ ও হবিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় এ গানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

ধামাইল গান: বিবাহের সময়ে কন্যাকে উদ্দেশ্য করে কিংবা নব পরিণিতা বউ ঘরে এলে তাকে কেন্দ্র করে যে রঙ্গ-কৌতুকময় গান গাওয়া হয় তাহাই ধামাইল গান। তবে রঙ্গ রসিকতাই যে এই গানের একমাত্র বিষয় তা কিন্তু নয়। বিবাহ উপলক্ষ ব্যতীত কাহিনীমূলক ধামাইলও রয়েছে। তন্মধ্যে চন্দ্রমুখী, আবেশ্বরী, রাধিকা, কোকিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে রচয়িতাদের মধ্যে কবি রাধারমণের ভণিতাযুক্ত অধিক সংখ্যক ধামাইল পাওয়া যায়।

নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে এ গান পরিবেশন করা হয়। এ গানে রঙ্গরস বেশি। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণ, বিয়ে, গায়েহলুদ, বৌভাত, মুখেভাত, জন্মদিনের উৎসবে সমবেত নারীরা একসঙ্গে নৃত্য করে এ গান বাড়ির উঠানে বা আঙ্গিনায় করেন। এ গানকে মেয়েলি গানও বলা হয়। হাওর অঞ্চলের ধামাইল গান এ অঞ্চলের লোক সংস্কৃতিতে নারীর একটি বিশেষ ভূমিকার কথাই জানান দেয়।

বিয়ের গান বা মেয়েলি গীত: সিলেট অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে এ গান গাওয়ার রীতি আছে। এ গান এতই জনপ্রিয় যে, কনে দেখার সময়ে, মঙ্গলাচারণে, পানখিলি অনুষ্ঠানে, জলভরনে, অধিবাস, সোহাগমাগা, দধিমঙ্গল, বিবাহ, কন্যাযাত্রা – প্রত্যেক পর্বে পর্বে এমন গানের লহরি বাংলাদেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

বারোমাসী গান: হাওর অঞ্চলে বারোমাসী নামে বেশকিছু লোকসংগীত পাওয়া যায়। এই বারোমাসী গানগুলো কিছু ঋতুচক্র নিয়ে রচিত, আবার কিছু যুবতী নারীর দুঃখ-বেদনা, সুখ-ভালোবাসা নিয়ে রচিত। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির পরিবর্তন এবং এর সাথে মানুষ্য জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কও বারোমাসীতে বিবৃত হয়। এই বারোমাসীর মধ্যে আছে লৌকিক বাংলার সংস্কার, বিশ্বাস, উৎসব, আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশাচার, জীবিকা, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি।

আবার প্রেমিক-প্রেমিকার বা স্বামী-স্ত্রীর সুখ-দুঃখ, বিরহ-জ্বালা নিয়ে জাগতিক নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বারোমাসী গানে। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা বাংলার বারো মাসের আবহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মনের আর্তি যে সুর ও ছন্দে প্রকাশ করে তাই বারোমাসী গান হিসেবে পরিচিত। এর মাধ্যমে নারী মনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি-আকুলতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই বারোবাসী গান হাওরের প্রতিটি অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়।

নানা বিশ্লেষণে দেখা যায় হাওরের সংস্কৃতি তার জীবন-জীবিকারে সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। হাওরের মানুষ স্বাধীনভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে গল্প-গান ও কবিতায়। এখানে নারীরা অনেক স্বাধীন, তারা স্বতন্ত্র পরিচয়ও বহন করেন। সংস্কৃতিতে ব্যাপক হারে তাদের প্রবেশাধিকার। তারা নৃত্য করে, গান গায়, প্রেমের কথা বলে অকপটে। হাওরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংস্কৃতি-প্রীতি আজন্ম লালিত। হাওরের মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকলেও মনের দিক থেকে তাঁরা অনেক উদার এবং লোকজ সংস্কৃতিই তাঁদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবেশের কোন উপাদানকেই বাদ দিয়ে মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হাওর-বাঁওড়, জলাশয় ও নিম্নাঞ্চচল এই পৃথিবীরই অংশ। বিচিত্র ও সম্ভাবনাময় এই জলাশয় রক্ষা করা না হলে প্রকৃতি রুষ্ট হতে থাকবে, তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। প্রকৃতির এই বিপর্যয়কে তখন যেন নিয়তি বলে চালিয়ে দেওয়া না হয়। দেশ ও দেশবাসীর মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হোক। শুভ হোক আগামী।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

তুই নিয়েছিস

দিলীপ দাস

তুই নিয়েছিস তুই নিয়েছিস তুই নিয়েছিস তুই
আমার নদী শাপলা বিল সর্ষে হলুদ ভূঁই
তুই নিয়েছিস তুই

তুই নিয়েছিস কলমি দাম বিলের পানকৌড়ি
শুশুক ভাসা বিকেল আর ভাটিয়ালী সারী

তুই নিয়েছিস মেঘনা তিতাস দত্তখলার চর
সহজ সুখ সহজ জীবন গাঙ শালিখের ঘর

তুই নিয়েছিস তুই
আমার নদী শাপলা বিল সর্ষে হলুদ ভূঁই

নারায়ণের ঘাট

সৈকত হাবিব

নারায়ণের ঘাটে গিয়েছি কতদিন
তবু আজও মনে হয়, আমি কি দেখেছি
তোমায় মাঝি, হে নারায়ণ, দেখেছি কি
কোনো জন্মে, তিতাসপাড়ে?

কত কৈশোরসন্ধে ও কুমারীসদৃশ ভোর...
গোধূলিবিকেল আর ঘরেফেরা পাখিসন্ধ্যায়
আমি হেঁটেছি, হেঁটে হেঁটে
চলে গেছি তিতাসহিজলছায়া মেখে...

আর অনেক অনেক রাতে
সৌরজ্যোৎস্না মেখেছি তিতাসহাওয়ায় আর গভীর
গভীর শুনেছি দূরগামী দাঁড়িদের
নিশি-জাগার শব্দ, পাখিডানার গান...

তবু, আজ, এই নির্ঘুম, শাহরিক রাতে
মনে হয়, তিতাস দেখিনি আমি কোনোদিন
দেখিনি তিতাসছায়া, সেই নারায়ণ
মাঝিকে কখনো দেখিনি আমি এই জন্মে
দেখেছি কেবল নদীর শব আর রক্ত
আর ধূলিদীর্ণ এক নারায়ণ-মুখ

অনাপন ঢোঁড়াসাপ

শওকত হোসেন

কখনোই ধরে দেখিনি তোমায়--শান্ত পানির ওপর দিয়ে
ধীরে চলে যাওয়ার মতোন তোমাকে দেখি আজও--

অনাপন ঢোঁড়াসাপ
পানিতে নামি, ডুব দিয়ে গোসলও করি,
যাকে ভর করে চলো তুমি, গায়ে মাখি, নাকে দেই,
মুখে তুলি বটে, পান করি না--

তবু কী বিশ্বাসে একই ঘরে থাকি
ভালোবাসি বলে নিজেরে প্রবোধ দিই--
কখনো নাইতে নামলে কিছুটা দূরত্বে থেকে আচমকা দেখা দাও
আচমকা চলে যাও কচুরির আড়ালে
আমি ভাবি, আমাকে হারালে!

যেই আবার জলপিঁপি, বুনোহাঁস, শিকারির ফাঁদ হতে
ছুটে আসা পানকৌড়ি
খুব কাছ ঘেঁষে চলে যায়
তুমি আসো ক্ষণিকের মায়া ধরে--

যারে এতো ভর করে অনায়াসে আসো যাও
তার মাঝে ডুবে যাই গোসলের নাম করে--
আর জাগবো না জেনে... ।

অঙ্কন

Zunaira Tasbiha
SJWS, CL-3

শিশুর জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার থালাবাটি নয়, বই

অলোক আচার্য

বইমেলা চলছে। বাঙালির প্রাণের উৎস বইমেলা। একটি বইপড়া প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। সেই দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালন করছি না। কীভাবে গড়ে তোলা যায় সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। গত বেশ কিছুদিন যাবৎ আলোচনা হচ্ছে শিশুদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দেওয়া উপহার নিয়ে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুশীল সমাজের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি সমালোচনা। এসব সমালোচনা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। সারা দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই প্রতি বছর নানা ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকে। বিশেষত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এছাড়াও জাতীয়ভাবেও ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকে। এরও বাইরে বিভিন্ন সংগঠনও আয়োজন করে প্রতিযোগিতার। সেসব প্রতিযোগিতায়ও একই চিত্র। কোমলমতি এসব শিক্ষার্থীদের হাতে পুরষ্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন দামের প্লেট বা গ্লাস বা এ জাতীয় কিছু। দিনশেষে হাতে একটি প্লেট নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তার মেধার স্বীকৃতি হলো সেই প্লেট! ওরা তখন থেকেই বুঝতে শেখে যে বইয়ের চেয়েও এসব থালা-বাটি দামী! কারণ এসব তাদের যোগ্যতার প্রেক্ষিতে দেওয়া হচ্ছে! সুতরাং বইকে দামী হিসেবে বা বন্ধু হিসেবে নেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই! একজনকে আপনি শেখাবেন এক বিষয় আর পরবর্তীতে তার কাছ থেকে আশা করবেন অন্য কিছু সেটা তো হয় না। একবার কি আমরা ভেবে দেখেছি যে, যদি এদের হাতে আমরা একটি বই তুলে দিতে পারতাম তাহলে ওরা বেশি উপকৃত হতো। ওদের মনোজগতে আমরা প্রভাব ফেলতে পারতাম। ওদের বোঝাতে পারতাম একটি বই আসলে কতটা দামী। একশ জনের একশ জনকেই তো বইটি পড়তে হবে না। যদি কয়েকজনও কৌতুহলবশত বইটি পড়ে এবং তার মধ্যে কয়েকজনের বই পড়ায় আগ্রহ তৈরি হয় তাহলে সমাজে ঠিক কী ধরনের বিপ্লব তৈরি হবে? একটি জাগরণ শুরু হবে। সেটি হবে বই পড়া প্রজন্ম গড়ে ওঠার জাগরণ।

আমাদের কাজ তো পাঠক তৈরি করা। কিন্তু হচ্ছে বিপরীত! হাতে প্লেট নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে ফটোসেশনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে। ছাত্রছাত্রীর হাতে প্লেট কেন থাকবে? একবার ভাবুন যে একটি থালা-বাটি নিয়ে বাড়ি ফিরলে সেটি কয়েকদিন বা বছর ব্যবহারের মাধ্যমেই শেষ হবে। আর বইটি তাকে সঙ্গ দিবে তার বেঁচে থাকা অব্দি। বইয়ের জ্ঞান তাকে পথ দেখাবে, শেখাবে ও সাবধান করবে। সেই সাথে আরও বই পড়তে উৎসাহিত করবে। তখন ওদের হাতে থাকবে বই। বই ওদের মুক্ত জ্ঞান অন্বেষণের পথ দেখাবে। এবার ভাবি যে একটি করে বই উপহার দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ? আসলে অত্যন্ত সহজ কাজ এটি। শুধু দরকার ইচ্ছা। আমরা ছাত্রছাত্রীর হাতে থালা-বাটি নয়, বই তুলে দিতে চাই, এই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে চাই। জন্মের পর থেকেই শিশুর মনোজগত ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। শিশুর চারপাশের জগৎ বিস্তৃত হতে শুরু করে। শিশু তার আশেপাশের শব্দ, বিভিন্ন বস্তু এবং মানুষ সম্পর্কে কৌতূহলোদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময়টায় শিশু মূলত খেলাধুলা করে। সে যা শেখে তা আনন্দের সাথে। প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা খেলাধুলার মাধ্যমেই হয়। সেই খেলাধূলার উপকরণের সাথে যদি হাতে বই তুলে দেওয়ার অভ্যাস করি তাহলে শিশুর মনোজগতে বই বিচরণ করবে। অভিভাবক হিসেবে সন্তানের জন্য জন্মদিনে বা বিভিন্ন সময় উপহার কিনে আনি। অথবা সন্তান অভিভাবকের সাথে গিয়ে উপহার কিনে আনে। শিশুর উপহার কেমন হওয়া উচিত?

শিশুর উপহার যা তার খেলার অনুষঙ্গ তা এমন কিছু হওয়া উচিত যা তার মনোজগতে ভাল প্রভাব ফেলবে। আমরা উপহার হিসেবে শিশুর হাতে বই তুলে দিতে পারি। কিন্তু জাতির দীনতা এমন যে উপহার হিসেবে বই কেনার কথা আমরা ভুলে গেছি।

যদিও কয়েক দশক আগে উপহার হিসেবে বই দেওয়ার প্রচলন ভালোভাবেই ছিল। জন্মদিনে বই ছিল সবচেয়ে সাধারণ উপহার। এখন সচরাচর কোনো শিশুর জন্মদিনে বই উপহার দেওয়া চোখেই পড়ে না। আর হঠাৎ দিলেও শিশু এবং তার অভিভাবকের মুখ থাকে বেজার! সজাগ জাতি হিসেবে আমাদের এই দীনতা সত্যিই অবর্ণনীয়! তখন উপহারের বইয়ের সাদা পৃষ্ঠায় উপহারদাতার নামও লেখা থাকতো তারিখসহ। কালক্রমে সেই প্রচলন থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন কতসব হাবিজাবি উপহার দিতে দেখি। এখন র‍্যাপিং কাগজে মোড়ানো থাকে চকচকে সব উপহার। চোখ ধাঁধানো উপহারের পাশে একটি বই কতই না বেমানান! অথচ বইয়ের মূল্য কেবল অর্থ দিয়েই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আবার সেসব বই আলমারিতে থেকেছে বছরের পর বছর। আজও কারও কারও ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে এসব উপহারের বই থাকলেও থাকতে পারে। মনে পড়ে কতশত স্মৃতি। শিশু নতুন নতুন বিষয়ে জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সে নতুন কোন শব্দ বলতে শেখে অথবা নতুন কোন কাজ করতে শেখে যা সে তার আশেপাশের মানুষদের করতে দেখে। মূলত শিশুর শেখার শুরু হয় এসময় থেকেই। যদিও এসময়ে তার শেখার স্থায়িত্ব বেশি হয় না। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সে শেখার ব্যাপারে ক্রমাগতই দক্ষ হয়ে ওঠে। এই শিখন প্রবৃত্তি সুস্থ প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে প্রায় সমানভাবেই ঘটে থাকে। এসময় যখন সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার প্রতি আচরণ হবে নিয়ন্ত্রিত।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে বই পড়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এর পেছনে আমাদেরও যথেষ্ট দায় রয়েছে। আমরা তাদের কী শেখাচ্ছি? তাদের বইমুখী করতে আমরা বাধা দিচ্ছি। বই পেলে যে একধরনের মুগ্ধতা তৈরি হয় তা ঠিক আছে কিন্তু কয়েকমাস যেতেই সেই মুগ্ধতা আর থাকছে না। মূল বই থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ঝুঁকছে গাইড বই, লেকচার শীট, প্রাইভেট এসবের প্রতি। প্রযুক্তির কারণেই হোক আর যাই হোক বই পড়ার অভ্যাসটা কমেছে।

আমাদের সেই দিন ফিরিয়ে আনতে হবে। একসময় বাইরে কয়েকদিনের জন্য ভ্রমণে গেলে সাথে থাকতো আবশ্যকীয় বই। এখন আর তালিকায় বই থাকে না। বই পড়া বিষয়টি তখনই স্বাভাবিক মনে হবে যখন ভেতর থেকে এক ধরনের তৃষ্ণা জাগ্রত হবে। তিনবেলা খাওয়ার জন্য আমাদের যে হাহাকার, একবেলা হঠাৎ না খেলে যে ক্ষুধাবোধ তেমনি একবেলা বই না পড়লে যদি সেরকম কোন বোধ হয় তখন বই পড়াটা মজ্জাগত হবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোন কাজ হিসেবে নয় বরং আর দশটা স্বাভাবিক কাজের মতই বই পড়া একটি স্বাভাবিক কাজ হবে। খেলাধুলা বা বিনোদন লাভের উপায় যেমন আমাদের আনন্দের উৎস তেমনভাবে বই যদি আমাদের আনন্দ উপকরণ হতে পারে তখন তা হবে মনের ক্ষুধা মেটানোর অন্যতম অনুষঙ্গ। তাছাড়া আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন লাভ কিছু হবে না। এজন্য সব ধরনের উপহার হিসেবে আমরা শিশু-কিশোরদের হাতে বই তুলে দেই। এই প্রথাটাই চালু হোক সমাজের সর্বস্তরে। জাতির এ দীনতা কেটে যাক কালক্রমে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক আর কোনো সংগঠন হোক শিশু-কিশোরের হাতে বই-ই উঠুক, অন্য কোনো বস্তুগত সামগ্রী নয়। আর সেটা হলেই কেবল একটি সুস্থ সুন্দর প্রজন্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। নচেৎ নয়।

লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট, পাবনা

ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে সিদীপের নতুন ভবনে পিঠা উৎসব

বাঙালি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বরাবরই উৎসাহিত করে থাকে দেশের অন্যতম শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)। কর্মস্থলের শত ব্যস্ততার মাঝেও সিদীপ কর্মীগণ বিভিন্ন পার্বণে বাঙালি লোকজ সংস্কৃতি ধারণ করে উৎসবে মেতে ওঠেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ নতুন সিদীপ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব । প্রধান কার্যালয়ের সকল

কর্মীর অংশগ্রহণে সকাল ১১টায় এই পিঠা উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসব উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা।

কৌতুক

ইংরেজি সত্যিই অদ্ভুত ভাষা।

Satisfactory মানে সতীশের কারখানা।

অথচ ডিকশনারিতে লেখা আছে সন্তোষজনক। মানে সন্তোষের বাবা।

(সংগৃহীত)

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে

বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

সিদীপ পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ পাবনার চাটমোহরে বোয়াইলমারি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুষ্ঠিত হলো বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। এতে সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব স. ম. এখলাস আহমেদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব কামরুজ্জামান, রাজিয়া ম্যাডাম, সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জনাব রাসেল ও অন্যান্য। আরও উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মনিরুল ইসলাম ও সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার পপি খাতুন। পুরস্কার পায় ৮ম শ্রেণীর গিয়াস ও হিয়া। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আবু রায়হান। সিদীপ প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা জনাব আলমগীর খান।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ কুমিল্লায় রায়পুর (গৌরিপুর) শাখার আওতায় ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুষ্ঠিত হলো বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব ওমর ফারুক। অনুষ্ঠানে সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার শিউলি আক্তার ও স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহ্সান উপস্থিত ছিলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ নাটোরে গোপালপুর -লালপুর শাখার আওতায় সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।

এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মো. লোকমান হাকিম, সিনিয়র শিক্ষক মো. আইয়ুব আলী, সিরাজিপুর দাঁইড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব মো. মকবুল হোসেন ও সহকারী শিক্ষক জনাব মো. আমজাদ হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার লোপা রানী সরকার, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মো. গোলাম রাব্বানী এবং সিদীপ প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ নাটোর জেলার বনপাড়া শাখার সেন্ট যোসেফ্স স্কুল এন্ড কলেজে মুক্তপাঠাগারের বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সহকারী শিক্ষক শিবদাস স্যান্যাল উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মহাবীর গোমেজসহ অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রধান কার্যালয় থেকে সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মো. গোলাম রাব্বানী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আবু হুসাইন, শিক্ষা সুপার ভাইজার সুমি আক্তার ও সিদীপের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪এ রাজশাহীতে পুঠিয়া শাখার আওতায় ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল গফুর উপস্থিত থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার হিসাবে বই তুলে দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পুঠিয়া ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মো. জামিল হোসেন, সেকমো মো. পলাশ এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনগঞ্জে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

২৪ জানুয়ারি ২০২৪এ নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনগঞ্জে সালাহউদ্দিন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাইস্কুলে উদ্বোধন হয়েছে সিদীপ পরিচালিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার। মুক্তপাঠাগারটি উদ্বোধন করেন স্কুলের সভাপতি সমাজসেবক জনাব মো. কুতুব উদ্দিন এবং বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মশিউর রহমান, সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মাকসুদ চৌধুরী, সিদীপের বিএম আব্দুর রহমান ও শামসুল হক এবং শিক্ষা সুপারভাইজার মোছা. শারমিন। সিদীপ প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা, পুরস্কার বিতরণ ও সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান

১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সিদীপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত হয় শিক্ষা সুপারভাইজারদের জন্য মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার বিষয়ক কর্মশালা, রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং সমাজকর্মী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, সিদীপ তার উদ্ভাবনী কর্মপ্রয়াসের ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা যেন মুক্তভাবে কারো অনুমতি ছাড়াই বই নিয়ে পড়তে পারে সেজন্য উন্মুক্ত পাঠাগার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় ২০২২ সালের জুলাই থেকে। সাধারণত সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারের নেতৃত্বে শিক্ষিকারা মিলে সমাজের মানুষের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করার পর স্থানীয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্মুক্ত স্থানে এই পাঠাগার স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে যে কেউ ইচ্ছেমতো বই নিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষা সুপারভাইজারদের উদ্যোগে এ পর্যন্ত দেশের ১১টি জেলায় ২৯টি বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। সমাজকর্মের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার গড়ে তুলছেন বলে ২৫ জন শিক্ষা সুপারভাইজারকে সমাজকর্মী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিজেকে একজন সমাজকর্মী বলে পরিচয় দেয়া পিপলস ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক এবং সিএসডব্লিউপিডি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব মো. হাবিবুর রহমান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া, সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য ডা. নারগিস আখতার এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বেশকিছু মূল্যবান বই প্রদান করেন সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্য ডা. নারগিস আখতার ও বিশিষ্ট অনুবাদক মনজুর শামস।

৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

৯ মার্চ ২০২৪এ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে '৬ষ্ঠ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মিলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতি গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা ও আমাদের মুক্তপাঠাগার' এবং 'শিক্ষার ধারণা বিস্তারে শিক্ষালোক'। উক্ত সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাজাহান ভুঁইয়া ও চেয়ারম্যান ফজলুল বারি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। সিদীপের গবেষণা কর্মকর্তা মনজুর শামসের সূচনা বক্তব্যের পর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা উপস্থাপন করেন সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম।

এরপর শিক্ষা ও মুক্তপাঠাগার নিয়ে আলোচনা করেন ইউল্যাব শিক্ষক খান মো. রবিউল আলম, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকার সম্পাদক ইলিয়াস উদ্দিন পলাশ, দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে আগত কলেজ অব আর্টসের শিক্ষক সঞ্জয় শর্মা, কবি সৈকত হাবিব, শিল্পী জাহিদ মুস্তাফা, লেখক-গবেষক সালেহা বেগম, জনবিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, লেখক সিরাজুদ দাহার খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগারিক মোশাররফ হোসেন, বার্ডের সাবেক কর্মকর্তা শিরিন হোসেন, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম, শিল্পী শিশির মল্লিক, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা রঞ্জন মল্লিক, শিল্পী দিলরুবা পাপিয়া, লেখক রিয়াজ মাহমুদ, সংস্কৃতিকর্মী নাজনীন সাথী, শিক্ষক মোজাম্মেল হক পাটোয়ারী, উন্নয়নকর্মী অনার্য নাঈম, কবি হোসেন আল মামুনসহ অনেকে।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, ঘন ঘন কারিকুলাম পরিবর্তনে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এছাড়াও তিনি বলেন, পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাছাই করা ভাল বই পড়তে হবে। শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ হওয়ার শিক্ষা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেন। এছাড়াও বক্তাগণ বিভিন্ন স্কুলে স্থাপিত সিদীপের 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের' নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সিদীপ কৈশোর কর্মসূচির পরিচালনায় বন্দর উপজেলায় মিনি ম্যারাথন ও ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

‘মেধা ও মননে সুন্দর আগামী’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস আগামী প্রজন্মকে দেশের উন্নয়নযাত্রায় শরিক করার লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা এবং মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) আর্থিক সহযোগিতায় কৈশোর কর্মসূচি পরিচালনা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার নাসিক ২৭নং ওয়ার্ডের চাঁপাতলী খেলার মাঠে সিদীপ কৈশোর কর্মসূচির আওতায় আয়োজন করা হয়েছিল উপজেলাভিত্তিক মিনি ম্যারাথন ও ফুটবল টুর্নামেন্ট।

সিদীপের সোনারগাঁও জোনের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আলীর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মহিউদ্দিন মহিন মাতবর। এ অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ শেষে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ‘মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গড়তে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। তোমরা লেখাপড়া ও খেলাধুলায় সম্পৃক্ত থাকলে অপসংস্কৃতি ও অপরাধমূলক কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবে। সিদীপ গত বছরেও এই মাঠে এমন একটি আয়োজন করেছিলো এবং ভবিষ্যতেও এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। এমন সুন্দর আয়োজনের জন্য আমি সিদীপ ও পিকেএসএফকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’ এ উপজলোর ৫টি ইউনিয়নের যুবকদের অংশগ্রহণে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা এবং ফুটবল টুর্নামেন্ট উপভোগ করে স্থানীয় জনসাধারণ সিদীপের এ আয়োজনের বিশেষ প্রশংসা করে।

আজও খুঁজি

তোফাজ্জল হোসেন তারা

এই সমুদ্র এই যে দ্বীপ এই যে জলরাশি
এই ভূমধ্য জরাজীর্ণ পাহাড় সমতল বাসী
মরুভূমি রাশি রাশি বালু দিগন্তর
এই বরেন্দ্র এই যে পাহাড় মরু তেপান্তর।

ঝাউবনে বাতাস বহে শনশন শব্দ অবকাশ
মরু-সাহারা সরীসৃপ গুল্ম আগাছা তরুলতা বনবিলাস।
মরুসমতল ভূমি খুঁজি আমি
যার লয় বুঝে তালে তালে হারিয়েছি ধন
পাবো কি কখন কি আছে মোর এ ভালে।

নীলাভ আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে গোধূলি লগ্ন তার
বেলা দিগন্ত সূর্য নেমেছে পাটে ধরণী অন্ধকার
শূন্যে মহাকাশ সাগর সমতল বিশাল অরণ্য পাহাড়
মহাপ্রলয় ঘূর্ণিঝড় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে মেঘ
আছরে ভেঙেছে শত শত বাড়ি ঘর ।

ভেঙ্গে পড়ল যেন মাথায় বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত
আমি এখন কোথা ছুটে যাই দিগন্ত পারাবার।
হারিয়েছি আমি খুঁজিতেছি যার পাবো কি কখনো তার
আমি আজও খুঁজি হন্যে হয়ে পাইনি খুঁজে তাঁর।।

লেবু চাষে সফল এক কৃষাণীর গল্প

মো. আব্দুল মান্নান সরদার

নাটোরে সদর উপজেলার হরিশপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোসা. মহিমা খানম। স্বামী মো. শফিউল ইসলাম। কৃষক পরিবারে জন্ম মোসা. মহিমা খানমের। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় খুব বেশি পড়ালেখা করার সুযোগ হয়নি তার। বিয়ে হয় গরিব পরিবারে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ১২ শতাংশ বসতভিটা এবং আবাদি জমি ৬৬ শতাংশ আছে মহিমা খানমের। তার ২ বিঘা জমিতেই তিনি বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করতেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। কৃষি কাজই তাদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিলো। মাঝে মাঝে মানুষের জমিতে শ্রম বিক্রি করতে হয়। মহিমা খানম বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করেন। অভাব অনটনে সংসার চলে তাদের। মহিমা খানমের ইচ্ছা হয় কৃষিতে কিছু একটা করার। পর্যাপ্ত জমি, আর্থিক অবস্থা ও কৃষি বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানদক্ষতা না থাকায় উদ্যোগ নিতে সাহস পান না। তার স্বামীর শ্রম বিক্রয়, হাঁস-মুরগি পালন ও কৃষির এই সামান্য আয় হতে কোন রকমে দিন কাটতো তাদের। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা।

এমতাবস্থায় বাড়ির কাছাকাছি একটি জমি (৩৩ শতাংশ) লিজ নেওয়ার সন্ধান পান। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় তারা জমিটি নিতে সাহস পাননা । জমিটি ছিলো চাষের উপযোগী । তারা দুইজনই পরিশ্রমী। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন কোন সমিতি হতে ঋণ নেওয়ার। বাড়ির পাশে খোঁজ নিয়ে সিদীপ সংস্থার মাঠকর্মীর সাথে কথা বলেন। তারা জানতে পারেন সিদীপ সাপ্তাহিক/ মাসিক ও ৬ মাস মেয়াদী ঋণ বিতরণ করে থাকে। এসব নিয়মকানুন জানার পর তিনি হরিশপুর শাখায় সিদীপের সদস্য হন। এরপর তারা ৫০ হাজার টাকা সাপ্তাহিক ঋণ গ্রহণ করেন এবং সেই জমি লিজ নেন। সেখানে বেগুনসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। বেগুন ও অন্যান্য সবজি চাষ করে মাসে খরচ বাদে প্রায় ৬-৭ হাজার টাকা আয় হয়। কিছুদিন পর তারা ৬ মাসের কৃষি ঋণ (এসএমএপি) বাবদ ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। ঋণ গ্রহণের সময় সিদীপ অফিস হতে একটি টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশান গ্রহণ করেন। এসময় তাদের উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসারের সাথে যোগাযোগ হয়। তারা নিজে থেকে যোগাযোগ করে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন। শাক-সবজি চাষের পাশাপাশি তারা সিদ্ধান্ত নেন বাড়ির পাশে ভিটামাটিতে লেবু চাষ করার। তারা সিদীপের মাঠকর্মীর (কৃষি) সাথে যোগাযোগ করেন এবং পরামর্শ নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করেন। তারা সীডলেস চায়না-৩ জাতের লেবু চাষ করার পরামর্শ দেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী লেবু চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তার বাগানে প্রচুর লেবু আছে। তারা নাটোর পাইকারী সবজি বাজারে ২০ টাকা হালি ধরে লেবু বিক্রয় করেন।

প্রতিমাসে ৩৩ শতাংশ জমি হতে মাসে ৮-১০ হাজার টাকা লেবু বিক্রয় করেন। বছরে প্রায় ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকার লেবু বিক্রয় করেন। সব খরচ বাদে বছরে প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা নীট লাভ হয়। সিদীপের ফিল্ড অফিসারের (কৃষি) পরামর্শে তারা লেবুর চারা উৎপাদনে আগ্রহী হন। তারা বলেন চারা বিক্রয় করে বছরে অতিরিক্ত ১৫-২০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। এখন তার লেবু বাগানে কিছু বেকার ছেলে মেয়ের কর্মসংস্থান হয়েছে। এসকল আয় হতে তার পরিবার এখন সচ্ছল। ছেলের পড়াশুনার পাশাপাশি মেয়ের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে দেন। তার স্বামী এখন নিজের সংসারে কাজ করে। শ্রম বিক্রয় করতে হয় না।

আর্থিক সহায়তা ও কৃষি বিষয়ক পরামর্শ পাওয়ায় মহিমা খানম সিদীপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তার এ সকল কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য সকল মানুষ কৃষি কাজ তথা লেবু চাষের প্রতি উৎসাহ পেয়েছেন এবং সবজি চাষ করতে আমাদের থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। এতে আমরা গর্বিত।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি)
পবা ব্রাঞ্চ, সিদীপ

অদম্য কৃষাণী হাবাধন বিবির সফলতার কথা

সঞ্জীব মন্ডল

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পোলমগরা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু হাবাধন বিবি। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন। ২ ছেলে ৫ মেয়ে। হাবাধন বিবির স্বামী অল্প বয়সেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর ছেলে-মেয়েদের ভরনপোষণ, তাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো তার পক্ষে অনেক কষ্টসাধ্য হয়। তিনি এই প্রতিকূলতার কাছে হার না মেনে কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। হাবাধন বিবি নিজের জমির পাশাপশি অন্যের জমি বর্গা চাষ করেন। প্রায়ই হাবাধন বিবি টাকার প্রয়োজনে ঠিক মতো কৃষি কাজ করতে পারতেন না।

এমন সময় তার প্রতিবেশীর মাধ্যমে হাবাধন বিবি জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের স্বল্প সুদে কৃষি কাজ করার জন্য কৃষিঋণ প্রদান করে । যে ঋণ গ্রহণ করলে সাপ্তাহিক বা মাসিক কোন কিস্তি দিতে হয় না, ফসল বিক্রয় করে ৬ মাস মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করলেই হয়। এরপর তিনি সিদীপে সদস্য হয়ে শিম চাষের জন্য ২০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। ২০,০০০ টাকা ঋণ পেয়ে তিনি প্রাথমিক ভাবে ৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫০ শতক বর্গা জমির ১ বছরের টাকা পরিশোধ করেন। বাকি ১৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫০ শতক জমিতে শিমের চাষ করেন এবং মৌসুম শেষে তিনি ৫৫,০০০ টাকার শিম এবং ২০,০০০ টাকার শিমের বীজ বিক্রয় করেন। এতে তার সর্বমোট ৭৫,০০০ টাকা আয় হয়। জমি তৈরি, বীজ ক্রয়, সার ও কীটনাশক ক্রয়ের খরচ বাদ দিয়ে তার নীট আয় হয় ৫৫,০০০ টাকা।

পরবর্তী ধাপে তিনি ১৫,০০০ টাকা কৃষিঋণ গ্রহণ করেন। এবার তিনি ৯০ শতক জমিতে ধান চাষ করেন। ৯০ শতক জমি থেকে প্রায় ৩০,০০০ টাকার ধান ও ১০,০০০ টাকার খড় বিক্রয় করেন। জমি চাষ, বীজ ক্রয়, সার ও কীটনাশক ক্রয়ের খরচ বাদ দিয়ে তার নীট আয় হয় ২৫,০০০ টাকা।

পূর্ববর্তী সফলতার কারণে চলমান ধাপে সিদীপ থেকে তাকে আবারো ২০,০০০ টাকা কৃষিঋণ প্রদান করা হয় এবং কৃষি বিষয়ক পরামর্শ দেয়া হয়। এবার তিনি ৪০ শতক জমিতে শিম ও ২০ শতক জমিতে লাউ, ২০ শতক জমিতে করলা, ৩০ শতক জমিতে ফেলন ডালের চাষ করেছেন। এর মধ্যেই তিনি ৩৫,০০০ টাকার শিম বিক্রয় করেছেন এবং প্রায় ২০,০০০ টাকার লাউ বিক্রয় করেছেন। তিনি জানান যে আরো ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকার শিমের বীজ বিক্রয় করবেন এবং আরো ১৫,০০০ টাকার লাউ ও লাউয়ের শাক বিক্রয় করতে পারবেন বলে ধারণা করছেন। এছাড়াও করলা বিক্রয় করে ১৮,০০০-২০,০০০ টাকা, এবং ফেলন ডাল থেকে আনুমানিক ১০,০০০ টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তিনি জানান যে, সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার সবজি চাষে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় দমনে সার্বিক পরামর্শ প্রদান করেন এবং শিম বিক্রয়ের জন্য চট্টগ্রাম শহরের সবজির আড়তের সাথে যোগাযোগ করিয়ে শিমসহ অন্যান্য সবজি বিক্রয়ে সহযেগিতা করেন। যার ফলে তিনি পূর্বের তুলনায় আরও ভালো দামে সবজি বিক্রি করতে পেরে ভীষণ খুশি। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাকে কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারের ব্যবহার, কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপস 'কৃষকের জানালা'র ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। তিনি আরো জানান কঠোর পরিশ্রম ও কৃষি কাজে সঠিক পরিকল্পনা তার সফলতার কারণ।

ফিল্ড অফিসার (এগ্রি)
মাইজদী ব্রাঞ্চ, সিদীপ

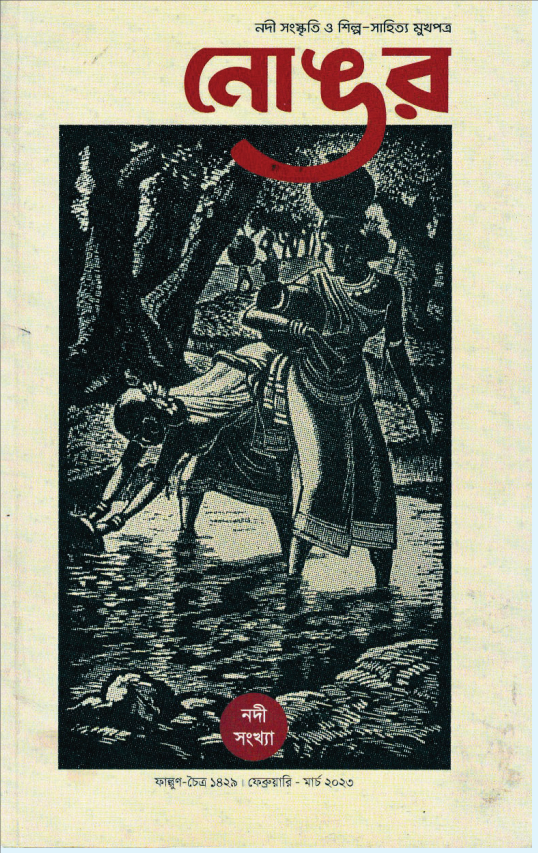

নদীর কথা নিয়ে ‘নোঙর’

মো. জাহিদুল ইসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ৭০০টি নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২২,১৫৫ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা মতে বাংলাদেশের নদীর সংখ্যা ৪০৫টি। *[উইকিপিডিয়া]*

বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা যায় স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে অবহেলা আর অসচেতনতায় এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন নদীতে লঞ্চ দুর্ঘটনায় প্রায় ২১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন শতশত। পাশাপাশি নদী দখল-দূষণের মহাউৎসবের প্রভাবে অধিকাংশ নদ-নদী এখন মৃত্যুপথযাত্রী। জলাভূমি ভরাট, দখল এবং শতবর্ষী বৃক্ষ নিধন করে গড়ে উঠছে অপরিকল্পিত নগর ও মহাসড়ক। নদীগুলোতে চলছে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন। এরকম অগণিত অব্যবস্থাপনায় প্রতিদিন হাবুডুবু খাচ্ছে আমাদের নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নদী ও প্রাণ-প্রকৃতি নিরাপত্তার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নদী-প্রকৃতি ও সমুদ্র সম্পদভিত্তিক সংস্থা ‘নোঙর’। নদী সংস্কৃতি ও শিল্প- সাহিত্য বিষয়ক মুখপত্র ‘নোঙর’-এর ফাল্গুন- চৈত্র ১৪২৯/ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয় ‘নদী সংখ্যা’ হিসেবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের পরিবেশ-বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ’ প্রদান করা হয়। ‘পলিসি লিডারশিপ’ ক্যাটাগরিতে তিনি এই পুরস্কার পান। পরিবেশ-প্রকৃতি ও নদী-বান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ‘স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড় বেদনার’ নিবন্ধটি হুবহু তুলে ধরা হয়েছে নদী সংখ্যায়। যেখানে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি নিয়ে তাঁর অব্যক্ত বিভিন্ন স্মৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের নানা ঘটনা ফুটে উঠেছে।

পানিসম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ২০০৯ সালে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানি ড. আইনুন নিশাত। তাঁর একটি জ্ঞানগর্ভ সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। নদী গবেষণায় তাঁর দূরদর্শী এবং সুগভীর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে নদী দখল-দূষণ ও নদী ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বিস্তরভাবে ফুটে উঠেছে সাক্ষাৎকারে। এর পাশাপাশি বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ এবং কার্টুনিস্ট জনাব শিশির ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার সংযোজন করা হয়েছে এতে। একান্ত আলাপচারিতার মাধ্যমে নদী ও প্রাণ-প্রকৃতি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে মূল্যায়ন মতামত তুলে ধরেছেন তিনি।

ঢাকা শহরের বেশকিছু খাল কাগজে-কলমে থাকলেও এগুলোর চিহ্নমাত্রও নেই বর্তমানে। বাকি যেগুলো আছে তার করুণ অবস্থা আমরা সবাই জানি। ঢাকার শাহবাগ থেকে মগবাজার পর্যন্ত খাল ছিল, ঢাকা ওয়াসার মানচিত্রে এর নাম পরীবাগ খাল। পরীবাগ, ধোলাইখাল, রায়েরবাজার, আরামবাগ, গোপীবাগ, সেগুনবাগিচা, গোবিন্দপুর, কাঁঠালবাগান, নারিন্দা, ধানমন্ডি ইত্যাদি এলাকায় ছিল খাল। সেখানে আজ পিচঢালা সড়ক। এই সকল চিত্র নগরবাসীর জন্য বর্তমানে স্বপ্নের মতো। নোঙর-এর নদী সংখ্যায় এ রকম না জানা অনেক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। ‘ঢাকার খাল’ নামক প্রতিবেদনে খুব সুন্দরভাবে ঢাকা শহরে থাকা খালের নাম ও বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

নদীর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কবি-সাহিত্যিকগণ আবহমানকাল ধরে নদী নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য কালজয়ী কাব্যকথা-গান-কবিতা-গল্প ইত্যাদি। ফকির লালন শাহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আব্দুল জব্বার আকন, মোহম্মদ নূরুল হুদা প্রমুখসহ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত কবির রচিত নদীকেন্দ্রিক কবিতা নোঙর-এর এই সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে।

সুমন শামস সম্পাদিত নোঙর-এ তুলে ধরা হয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথের নিরাপত্তাহীনতা, নদী ভরাট, দখল-দূষণ, নদীর অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশিষ্ট নদী গবেষকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প, নদী পরিচিতি, আন্তঃসীমান্ত নদী পরিচিতি, মতামত, শিল্প-সংস্কৃতি, নদী সংস্কৃতি এবং নোঙর কর্মসূচি নিয়ে কিছু প্রতিবেদন।

২০০৪ সালের ২৩ মে গভীররাতে মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চ দুর্ঘটনায় অসংখ্য যাত্রীর সাথে নিহত হন নোঙর-এর সম্পাদক সুমন শামসের মমতাময়ী মা। সম্পাদক সেই হৃদয়নিংড়ানো স্মৃতি তুলে ধরেছেন ‘নদী আমার মা’ নামক স্মৃতিচারণে। নোঙর-এর নদী সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয় ‘মা’ আছিয়া খাতুন, ‘বাবা’ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার আকন ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৌপথে নিহত সকল হতভাগ্য যাত্রীদের প্রতি। শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদের বিভিন্ন চিত্র সংখ্যাটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে অনেকগুণ। সংখ্যাটির প্রচ্ছদ করেছেন দেওয়ান আতিক এবং অলংকরণ করেছেন মো. শাকিল শরীফ।

লেখক: সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত

সিদীপে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) ১৭ মার্চ ২০২৪-এ যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করেছে। এদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদীপের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সূর্যাস্তের আগে তা নামিয়ে রাখা হয়। প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, র‍্যালির আয়োজন করেন। দিবসটি উপলক্ষে দুস্থ ও এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। ১৭ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সকাল নয়টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের কাছাকাছি র‍্যালিটি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) নেতৃত্বে সব এনজিও'র অংশগ্রহণে সমন্বিত র‍্যালিতে অংশ নেয় এবং সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার নেতৃত্বে সিদীপ প্রতিনিধি দল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

SHIKKHALOK
(a CDIP education bulletin)
11th year 1st issue • January-March 2024

শিক্ষালোক